সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

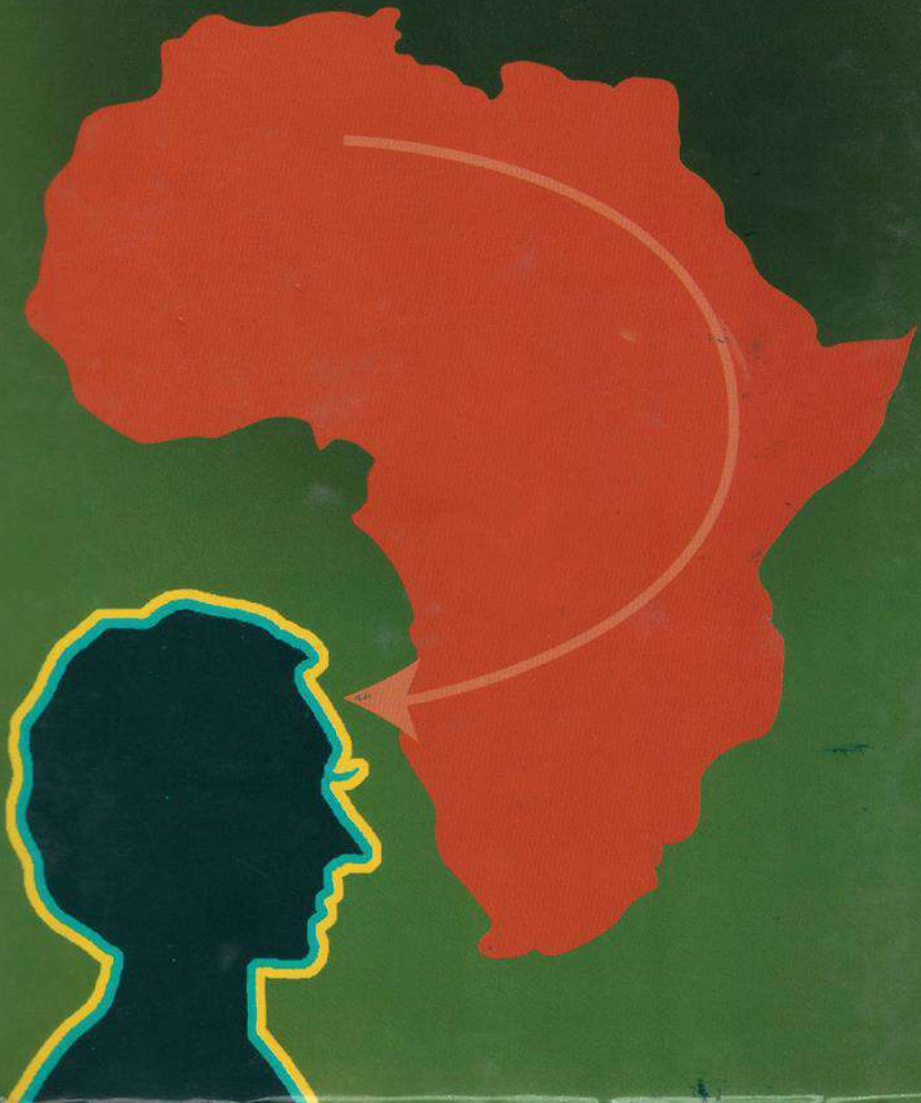

লেখক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং বিজ্ঞান লেখক হিসাবে সুপরিচিত। এদেশের প্রথম জনতোষ বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তাঁর সম্পাদনায় এখন নিয়মিত প্রকাশনার পঞ্চম দশকে রয়েছে। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা অসংখ্য। বইয়ের সংখ্যাও পঞ্চাশের কাছাকাছি। ২০০৭ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে মেহের কবীর বিজ্ঞান সাহিত্য পুরস্কার তাঁর এই বিষয়ক স্বীকৃতিগুলোর সাম্প্রতিকতম। নিজের বিষয় পদার্থবিদ্যার বাইরেও বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ রয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে সেটি যেমন প্রকাশিত তেমনি টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর দীর্ঘ দিনের অবদানেও তা পরিস্ফুটিত। তিনি 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' শীর্ষক একটি বক্তৃতামালায় নিয়মিত সর্বসাধারণের সামনে আকর্ষণীয় বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই বইটি সেই বক্তৃতামালারই একটি বিষয়ের পুস্তকরূপ। চ্যানেল আই এই বক্তৃতামালাটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে টেলিভিশনে সম্প্রচার করে থাকে।

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বক্তৃতামালার ভূমিকা

'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' এই শিরোনামে বক্তৃতামালাটি আয়োজিত হয়েছে সিএমইএস ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে। বিজ্ঞানের একেবারে আধুনিক জ্ঞানগুলো সর্বসাধারণের বুঝার ও উপভোগ করার উপযোগী করে তুলে ধরার জন্যই এই আয়োজন। সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ পরিস্থিতিটি জানাবার দায়িত্বও এই বক্তৃতামালা নিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিকতম অবস্থাটির খোঁজে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান জার্নাল ও ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যের অনুসন্ধান করতে হয়েছে। সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যেন বাদ না পড়ে সেই চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি বিষয়টির অ-আ-ক-খ অনেকের অজানা থাকতে পারে বলে সেই পরিচিতি স্তর থেকেই শুরু করতে হয়েছে। এটি করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞের ভঙ্গি, ভাষা, টেকনিক্যাল শব্দাবলি, সংকেত, গণিতের ব্যবহার ইত্যাদিকে এড়িয়ে চলতে হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয় আলোচনা করতে হলে এগুলোর প্রত্যেকটি প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একমাত্র এগুলোর মাধ্যমই বৈজ্ঞানিক জটিলতাকে সহজে নির্ভুলভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব। অথচ তা করতে গেলে শ্রোতারা এগুলোর সঙ্গে অন্তত কিছুটা হলেও পরিচিত থাকবেন এমন প্রত্যাশা করতে হয়। তখন ব্যাপারটি আর 'সবার জন্য' থাকে না। তাই বক্তৃতাকে সব সময় ছিমছাম রাখা সম্ভব হয়নি একে সর্বজনবোধ্য করার স্বার্থে। বরং আমরা চেষ্টা করেছি সাধারণ সরল ধারণার ভিত্তিতেই অতি আধুনিক এই ব্যতিক্রমী ধারণাগুলোকে খাড়া করতে। স্কুলের সাধারণ বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু জেনেছি শুধু ঐটুকুই সম্বল করে এগোবার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বুঝিয়ে বলতে হয়েছে বেশি, উপমা ব্যবহার করতেও হয়েছে বেশি।

বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি মূল সুর অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ মূল সুর হলো মানুষকে নিয়ে। আমরা ধরে নিয়েছি সবাই একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী হবেন– তা হলো নিজেদেরকে নিয়ে। মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, আমরা কী দিয়ে গড়া, কেমন করে আমরা ভাবি, কেমন করে কাজ করি, অন্য সব কিছুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, ভবিষ্যতে আমাদের কী হতে পারে– এসব প্রশ্নে স্বাভাবিক ভাবেই সবার কৌতূহল অনেক বেশি। তাই সর্বশেষ বিজ্ঞানকে আমাদের নিজেদের সঙ্গে যত বেশি যুক্ত করা যাবে ততই আগ্রহ বাড়বে, সেটি যদি জটিল আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ও হয় তাও। তাই আমরা মোটের ওপর মানবকেন্দ্রিক বিশ্ব ইতিহাসকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি বক্তৃতামালায়। একেবারে সময়পঞ্জি অনুযায়ী ইতিহাস নয়, তবে মানুষের শিকড় কোথায় কীভাবে কতদূরে বিস্তৃত হয়েছে সেই প্রশ্নকেই নানাভাবে বক্তৃতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন কোনো বিষয়কে ধারণ করা হয়েছে প্রায় দুই ঘণ্টার একটিমাত্র বক্তৃতায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের জন্য এ রকম দুটি, তিনটি এমনকি চারটি বক্তৃতারও প্রয়োজন হয়েছে– কিছু দিন পরপর। অবশ্য প্রত্যেকদিনের বক্তৃতার সঙ্গেই প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ছিল, যাতে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের নতুন কৌতূহলগুলোকে মিটানোর কিছুটা চেষ্টা করা যায়। এ বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এই সিরিজের বইগুলো। বক্তৃতার টেলিভিশন সিরিজ, এর সিডি রেকর্ডিং এবং বইয়ের এই সিরিজ সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞানের একটি ধারণা দিতে পারবে বলেই আশা করছি।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

এই বইয়ের ভূমিকা

আধুনিক মানব প্রজাতি হিসাবে আমরা আছি শুধু গত প্রায় দেড় লক্ষ বছর ধরে। *হোমো সেপিয়েন্স* (যার অর্থ 'জ্ঞানী আমরা') নামে এই প্রজাতিটির উদ্ভব আফ্রিকাতে, তার পূর্ববর্তী অন্য রকম মানুষের মধ্য থেকে। মাত্র ৮০ হাজার বছর আগে এরা আফ্রিকার বাইরে এসে নানা মহাদেশে ছড়িয়েছে আজকের সব মানুষের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ হিসাবে। তখন থেকেই ওরা অনন্য– প্রধানত তাদের উন্নত মস্তিষ্ক ও ভাষার কারণে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস শুধু এই হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীতে আমরা একক মানুষ প্রজাতি হিসাবে থেকেছি মাত্র গত ৩০ হাজার বছর ধরে। এর আগে আরও অন্য রকম মানুষও ছিল– ভিন্ন প্রজাতির মানুষ। শেষের দিকে দৃশ্য পটে আবির্ভূত হবার পর আমরা হোমে সেপিয়েন্সরা তাদের পাশাপাশি বাস করেছি। পরে তারা বিলুপ্ত হয়েছে, শুধু আমরাই আছি। তার আগে ছিল আরও প্রাচীন নানা মানব প্রজাতি, এবং তারও আগে মানব-সদৃশ প্রজাতিরা। এভাবে মানুষের দীর্ঘতর ইতিহাস অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ বছরের। মজার ব্যাপার হলো ওদের প্রায় সবারই প্রারম্ভটি ঘটেছে ঐ আফ্রিকাতেই। সেখান থেকেই বার বার অন্যত্র ছড়িয়েছে আগের মানুষরা। এক সময় অবশ্য তারা সবাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে সব জায়গা থেকে। কিন্তু তাদের উপস্থিতির চমৎকার প্রমাণ রেখে গেছে ফসিল কঙ্কাল, হাতিয়ার এবং তাদের জীবনের আরও নানা নিদর্শনের মাধ্যমে। আধুনিক বিজ্ঞান এ সবের চমৎকার বিশ্লেষণ করতে পারছে, উদ্ঘাটন করতে পারছে সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষের দেহ গঠনকে, তাদের জীবন কাহিনীকে, এক প্রজাতির মানুষ থেকে অন্য প্রজাতিতে বিবর্তিত হবার পরিস্থিতিকে।

একেবারে সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে সব চেয়ে চমকপ্রদ সব জ্ঞান দিতে পেরেছে ডিএনএর বিশ্লেষণ। অতীতে ফসিল গবেষণায় যেখানে যেখানে অনিশ্চয়তা ছিল সেগুলো এখন অনেকটা দূর করে দিয়েছে ডিএনএভিত্তিক জেনেটিক গবেষণা। ডিএনএ-কে অনুসরণ করেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি আমাদের আফ্রিকান উৎস সম্পর্কে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কাল ও পথ সম্পর্কে, এমনকি সে সময়ের জীবনযাত্রার প্রকৃতি সম্পর্কেও। এ সম্বন্ধে এখনো নিত্য নতুন জ্ঞানের যোগ হচ্ছে। এই ২০০৭ সালে প্রকাশিত ডিএনএ গবেষণাতেও আগের মানব প্রজাতিগুলোর সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু সম্পর্ক নতুনভাবে নির্ণিত হচ্ছে। এ গবেষণার সব চেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো কী ভাবে মানুষের মস্তিষ্ক ও তার চিন্তার অনন্য রূপ– তাকে ভাষা ও কালচারের অধিকারী করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে মানুষ নিজে বিবর্তনের নির্বাচনী চাপ থেকে অনেকখানি বেরিয়ে এসে নিজের সৃষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারাই সেই চাপের মোকাবেলা করতে পারছে। দৈহিকভাবে তার বিবর্তনের সম্ভাবনা সে অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছে। এখানেই মানুষের সব চেয়ে বড় অনন্যতা। 'আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা' বইটি সেই অনন্যতা অর্জনের ইতিহাসের কিছু দৃশ্যপট তুলে ধরার চেষ্ট করেছে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

লুসি ১১
বুদ্ধি দিয়ে বাঁচা ২৫
মানুষের প্রথম বিশ্বযাত্রা ৩৫
প্রায় জ্ঞানীরা এবং অবশেষে জ্ঞানী আমরা ৪৭
ডিএনএ দিয়ে অতীতকে জানা ৬৫
মস্তিষ্ক, ভাষা, কালচার ৭৬
বক্তৃতারশেষে প্রশ্নোত্তর ৯৬

লুসি

জ্ঞানী আমরা

আমরা নিজেদের প্রজাতির নাম দিয়েছি– 'হোমো সেপিয়েন্স'। এ কথাটির মানে হচ্ছে 'জ্ঞানী আমরা'– 'হোমো' মানে আমরা আর 'সেপিয়েন্স' মানে জ্ঞানী। নিজেদেরকে জ্ঞানী বলা খুব বিনয়ী ব্যাপার নয়, তবুও এই নামই আমরা দিয়েছি– নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছি হোমো 'গণের' সেপিয়েন্স 'প্রজাতি' হিসাবে। এখন আমরা জানি এ প্রজাতিটির বয়স মাত্র দেড় লাখ বছরের মত। অর্থাৎ প্রায় হুবহু একই রকম মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমাদের প্রজাতিটি রয়েছে এই দেড় লাখ বছর। এই সময় ধরে বিশ্বজোড়া আমাদের এই প্রজাতি মোটের ওপর একই জৈবিক গুণাবলির অধিকারী রয়েছে আজ অবধি, যদি সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কথা বাদ দিই। যাদের থেকে বিবর্তিত হয়ে এই আমরা এসেছি– দেড় লাখ বছর পেছনের সেই তাদেরকেও 'আমরা' বলে চিহ্নিত করি বটে, কিন্তু 'জ্ঞানী' বলে আর চিহ্নিত করি না, একই 'গণের' ভিন্ন 'প্রজাতি' হিসাবে ভিন্ন নাম দিই। পৃথিবীর ইতিহাসে, কিংবা প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাসে, এমন কি মানব বিবর্তনের পুরো প্রেক্ষাপটে দেড় লাখ বছর মোটেই বড় একটি সময় নয়। তবে আমাদের সাধারণ ইতিহাস চর্চায় এটি দীর্ঘ সময়।

আমাদের সভ্যতার ইতিহাস দশ হাজার বছরের মতো। এরও পুরোটা ঠিক ইতিহাসের আওতায় আসেনি; যে রকম ইতিহাসে বইপত্র, দলিল কিংবা নিদেনপক্ষে ব্যবহার্য জিনিসপত্র ভালমত পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা অবশ্য আরও পেছনের প্রাগৈতিহাসিক সময়ের নানা নির্দশন আবিষ্কার করে সে সময়ের কথা আন্দাজ করেছেন– কিন্তু তাও বড়জোর হাজার বিশ পঁচিশেক বছর পেছনের

ব্যাপার। এর আগের সব কিছুর জন্য মানব কঙ্কালের প্রস্তরীভূত রূপ– ফসিল, আর পাথর প্রভৃতি অবিনাশী জিনিসে তৈরি কিছু হাতিয়ার নমুনার ওপর ভিত্তি করেই আমাদেরকে সব কথা বলতে হচ্ছে। এভাবেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন নৃতত্ত্ব। কিন্তু আজকের আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে আরও বহু প্রাচীন কাল সম্পর্কে অনেক নির্ভুলভাবে জানার সুযোগ করে দিয়েছে, যা রীতিমতো অবাক করার মতো। প্রধানত এসব সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ভিত্তিতেই এ বক্তৃতায় আমরা এগুবো, আমাদের পূর্বসূরিদের কাহিনীকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করব।

ডিএনএ নির্দেশ করছে আফ্রিকার দিকে

বলেছি দেড় লাখ বছরের আগে দৈহিক ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে আমাদের মতো মানুষ ছিল না। যারা ছিল তারা ভিন্ন রকমের মানুষ। তারও আগে আরও ভিন্ন রকমের। এভাবে পেছনের দিকে গিয়ে প্রাচীনতম যে মানব-সদৃশদের চিহ্নিত করতে পারছি তাদের কাল পঁয়তাল্লিশ লাখ থেকে পঞ্চাশ লাখ বছর আগের। এর আগের ইতিহাস মানুষের নয়, এমনকি মানব-সদৃশদেরও নয়। সে ইতিহাসে এককভাবে শুধু আমাদের অধিকার নাই। আজ জীবজগতে যে এইপ (নর-বানর) আমাদের কাছাকাছি-যেমন শিম্পাঞ্জি- তাদেরও অধিকার রয়েছে। মতো আগের এসব কথা আমরা কেমন করে বলতে পারছি? বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণেই পারছি। মানব-সদৃশদের প্রাচীনতম ফসিলগুলো সব পাওয়া গেছে আফ্রিকাতে। সেগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা গেছে তাদের কাল এবং তাদের মানব-সদৃশ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। এসব ফসিল যেমন প্রাচীন মানুষের আফ্রিকান উৎপত্তির দিকে নির্দেশ করে, তেমনি আজকে ডিএনএ গবেষণা এ সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত করেছে। বিশেষভাবে বলা যায়, অতি সাম্প্রতিক মানব ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এর কথা। এই সেদিন ২০০০ সালের দিকে মানব কোষের ডিএনএ পরম্পরায়গুলোর উদ্ঘাটন ছিল মানুষের পুরো জেনেটিক 'ব্লুপ্রিন্ট' পড়ে ফেলার মতো একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এর ফলে যে অভাবনীয় সব কাজ সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো কিছু মানুষের ডিএনএ নমুনা নিয়ে তা পরীক্ষা করে এখন আমরা মোটামুটি বলতে পারি তাদের সবার সাধারণ পূর্ব পুরুষ– যার থেকে তারা সবাই এসেছে– সে কত প্রজন্ম আগের মানুষ। যেমন ধরুন এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে আমরা যারা উপস্থিত আছি– তাদের ডিএনএ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু প্রজন্ম পেছনে গেলে একজন মানুষ রয়েছেন যিনি এখানকার সবারই পূর্বপুরুষ– এবং বলে দেওয়া যাবে সেটি কত প্রজন্ম আগে। একই কাজ পুরো পৃথিবীব্যাপী করা যায়। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ডিএনএ নমুনা

নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, আজকের সব মানুষের আদিতম সাধারণ পূর্বপুরুষ বাস করেছে প্রায় দেড় লাখ বছর আগে এবং তা আফ্রিকায়। আরও বুঝা গেছে, আজ থেকে ৮০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত আমাদের প্রজাতির সব মানুষ আফ্রিকাতেই শুধু ছিল, তারপর অন্যান্য মহাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। অবশ্য এখবরটা যে আমরা ডিএনএ-র সাহায্যে এই প্রথম পেলাম তাও নয়। আমাদের মতো মানুষের সর্বপ্রাচীন কঙ্কালের ফসিল পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকাতেই– এক লাখ পনেরো হাজার বছর পুরনো ফসিল। আর আফ্রিকার বাইরে যাদের ফসিল পাওয়া গেছে তারা ৮০ হাজার বছরের চেয়ে কম পুরনো। কাজেই ফসিল থেকে কিছুটা আভাস তো পাওয়াই যাচ্ছিল হোমো সেপিয়েন্সদের আদি কথা নিয়ে। কিন্তু আজকের দুনিয়াজোড়া মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। সেজন্যই তো আমাদের বক্তৃতার বিষয়– 'আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা'। ডিএনএ ঠিক কীভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে তা আমরা পরে দেখব।

মানব-সদৃশ হবার পথে ভিন্নযাত্রা

অন্তত কিছু মৌলিক বিষয়ে আজকের যে কোনো প্রাণীর তুলনায় বেশি মানব-সদৃশ এমন যাদেরকে আমরা আমাদের সর্বপ্রাচীন পূর্বসূরি মনে করতে পারি, তাদের কাল আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ বছর আগে। এরকম সময়ে বা তার কিছু আগেপরে এই মানব-সদৃশরা অন্য সব প্রাণীর ধারা থেকে তাদের পৃথক যাত্রা শুরু করেছিল। তাও ঐ আফ্রিকারই কিছু কিছু অঞ্চলে। তাদের প্রাচীনতম ফসিলগুলো সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে– যার সব চেয়ে পুরনোটির বয়স ৪৪ লক্ষ বছর। তবে এখানেও ডিএনএ-র বিশ্লেষণই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য শুধু মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণই নয়, জীবতাত্ত্বিকভাবে মানুষের সব চেয়ে কাছের যে প্রাণীরা আজকাল রয়েছে তাদের ডিএনএও দরকার হয়েছে। ২০০০ সালে মানব জেনোম সিকোয়েন্সিং সফলভাবে শেষ হবার পরপরই তুলনা করে দেখার জন্য শিম্পাঞ্জি, গরিলা ইত্যাদি যে সব প্রাণী মানুষের বেশি কাছে তাদের ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছে। এর থেকে যে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি বের হয়ে এসেছে যে শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের জেনোমের পার্থক্য মাত্র ১.২% , অর্থাৎ উভয়ের বাকি ডিএনএ সিকোয়েন্স প্রায় একই। এই যে একটি প্রাণীর সঙ্গে তার কাছাকাছি আর একটি প্রাণীর জেনেটিক গঠনে মোটের ওপর তফাৎ সেটি উভয়ের পূর্বসূরিদের মধ্যে কালক্রমে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে উভয়ের পূর্বসূরির পৃথক-যাত্রা শুরু হবার পর থেকে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এরকম পার্থক্য ঘটার হার মোটামুটি একই।

অর্থাৎ ধরা যাক যদি এক লক্ষ বছরে ১% পার্থক্য সৃষ্টি হয়, ২% পার্থক্য সৃষ্টি হতে লাগে তার দ্বিগুণ সময়। এদিক থেকে একে একটি দীর্ঘমেয়াদী 'আণবিক ঘড়ি' হিসাবে বিবেচনা করা যায়– ডিএনএ অণুর মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির ওপর তার সময় নিরূপণ নির্ভর করে বলে।

এইপ গোষ্ঠীর জীবজগতে মানুষকে যে শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটি আফ্রিকান শাখা। এই শাখা এশীয় শাখা থেকে বহুদিন আগে পৃথক হয়েছে।

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে দেখা গেছে, আফ্রিকান শাখার জেনোমের সঙ্গে (আজকের শিম্পাঞ্জি, গরিলা, মানুষ যার অন্তর্ভুক্ত) এশীয় শাখার (আজকের ওরাং ওটাং যার অন্তর্ভুক্ত) তফাৎ হলো ২%। এই দুইয়ের পার্থক্যের আবার প্রায় তিনগুণ বেশি পার্থক্য হলো এশীয় এইপ শাখার সঙ্গে প্রাচ্য দেশীয় বানরের ডিএনএ-র। অর্থাৎ কিনা মানব ধারা পর্যন্ত আসতে আসতে পার্থক্য দাঁড়িয়েছে মোট ৬%। কিন্তু প্রাচ্য দেশীয় বানরের আর এইপের পৃথক যাত্রা শুরুর সময়টি ফসিল গবেষণা ও ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে ভালোভাবেই জানা রয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন বছর আগে *এজিপটোপিথেকাস* নামে চিহ্নিত প্রথম এইপের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। ঐ সময়ের পর থেকে জীবজগত এইপের একটি প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল, তাই সময়টি ফসিল ও ভূতত্ত্বের দিক থেকে ভালোভাবে চিহ্নিত। এর মানে হলো ডিএনএ-র 'আণবিক ঘড়ি' অনুযায়ী ত্রিশ মিলিয়ন বছরে পরিবর্তন হয়েছে ৬%। কাজেই শিম্পাঞ্জির সঙ্গে আজকে ১.২% পরিবর্তন ঘটতে সময় লেগেছে সোজা ঐকিক নিয়মের হিসাবেই প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর অর্থাৎ ৫০ লক্ষ বছর। এটি ফসিল থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক সময়েরও বেশ কাছাকাছিই বটে। এই কারণেই আমরা এখন বেশ আস্থার সঙ্গেই বলতে পারি যে আমাদের পূর্বসূরিদের পৃথক মানব-যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে। এটিই মানুষ হবার পথে আমাদের দীর্ঘ যাত্রার প্রারম্ভ।

ভিন্নযাত্রা কেন ঘটল

প্রশ্ন হলো এই পৃথক যাত্রাটি হয়েছিল কেন? প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় এইপ গোষ্ঠীর কিছু প্রাণী কেন এই পৃথক যাত্রা শুরু করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল? আসলে এ ধরনের পৃথক যাত্রা জীবজগতে মাঝে মধ্যে ঘটে যার ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। এটিই জীবের বিবর্তন। বিবর্তনের পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, এর মূলে দুটি জিনিস কাজ করে– এক, নানা কারণে জেনেটিক গঠনে স্বাভাবিকভাবেই কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। দুই, সেই বৈচিত্র্য থেকে কখনও কখনও কোনো কোনোটি পারিবেশিক

পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থায় এসে টিকে যায় ও বংশানুক্রমে বিস্তৃত হয়। বৈচিত্র্য না থাকলে তো পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। সবাই যদি হুবহু একে অপরের মতো হয় তা হলে তো নতুন কিছু হবার সম্ভাবনাই থাকত না। এ বৈচিত্র্য কয়েকটি প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি হলো জেনেটিক গঠনে মিউটেশন বা দৈবাৎ পরিবর্তন। জীবদেহে ডিএনএ বিন্যাসকে কোষ থেকে কোষে নকল হতে হয়। বংশ পরম্পরায়ও এটি নকল হতে হয়। এভাবে সৃষ্ট ডিএনএ প্রতিলিপিতে হুবহু একই ব্লু-প্রিন্ট যায় বলেই একই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কিন্তু এ নকলে দৈবাৎ ভুল হয়। এক দলিল থেকে অন্য দলিল নকল করার সময় আমাদের যে ভুল হয় অনেকটা সে রকম। এসব ভুল সংশোধনের জন্য জীবকোষেই ব্যবস্থা থাকে এক রকম স্বয়ংক্রিয় 'প্রুফ রীডারের'– মুদ্রণ কাজের প্রুফরীডারদের মতোই যা নকলকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও প্রায়শ দু-একটি ভুল থেকে যায়– যা বৈচিত্র্যের একটি কারণ ঘটায়। তাছাড়া যৌন প্রজননের জন্য সাধারণ কোষ ভেঙ্গে যখন বাবার শুক্রকোষ আর মায়ের ডিম্বকোষ তৈরি হয় তখনো তাসের শাফলিং এর মতো জিনগুলো ঐ কোষের এক একটিতে এক এক সমাহারে সজ্জিত হয়। এর অনেকগুলো থেকে বাবার একটি শুক্রকোষ ও মায়ের একটি ডিম্বকোষের সমন্বয়ে যখন সন্তানের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তখনো সে কোনো সমাহারটি পাবে তাতেও বেশ কিছু দৈবাৎ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বৈচিত্র্য মূলধারার কাছাকাছি থাকে। খুব আলাদা রকম কিছু ঘটলে তা মূলধারার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। যেমন হাতের পাঁচ আঙ্গুলের স্বাভাবিকতার মধ্যে কালেভদ্রে ছয় আঙ্গুলের কোনো শিশু জন্ম নিতে পারে। কিন্তু বংশগতিতে এই অস্বাভাবিকতা বেশি এগুতে পারে না। কিন্তু যদি ধরা যাক, ঐ ছয় আঙ্গুলে শিশুরা বড় হয়ে মূলধারা থেকে আলাদা হয়ে এমন কোনো বিশেষ পারিবেশিক পরিস্থিতিতে পড়ল যেখানে ছয় আঙ্গুলের কোনো বড় ধরনের সুবিধা আছে এবং ছয় আঙ্গুলের ছেলেমেয়েরাই সেখানকার প্রতিকূলতায় বেশি সংখ্যায় টিকে বড় হতে ও বংশবিস্তার করতে পারে– তা হলে হয়তো বহু প্রজন্মের পর ছয় আঙ্গুলটাই ওখানকার গোষ্ঠীতে স্বাভাবিক হয়ে পড়তে পারে। এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন।

এরকম ঘটনা বিশেষভাবে ঘটতে পারে কোনো প্রজাতির ছোট কোনো বিচ্ছিন্ন দল যখন এক রকম সংকটের অবস্থায় চলে যায় এবং বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। পারিবেশিক সংকটে টিকে থাকার ক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিবর্তিত গুণাগুণ হয়তো তখন খুব বেশি সহায়ক হয়ে উঠতে পারে– বৈচিত্র্যের ফলে যা কারও

কারো মধ্যে দৈবাৎ এমনিতেই দেখা দিয়েছিল। সংকটে সেগুলোই ক্রমে বেশি বেশি টিকে এবং প্রকট হয়ে বহু প্রজন্মের পর বিচ্ছিন্ন মূলধারার সঙ্গে মতো পার্থক্য হয়ে যার যে– প্রজাতিটাই বদলে যায়। মূলধারার সঙ্গে তাদের আর কোনো সংশ্রব থাকে না– উভয়ে মিলে বংশবিস্তার আর সম্ভব হয় না। তারা একটি আলাদা ধারার নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে । এভাবে সংকটের ফলে হয় ঐ ছোট দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, নইলে নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়। প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে যারা মানব-ধারা সৃষ্টি করেছিল তাদের ক্ষেত্রে এই শেষেরটিই হয়েছিল।

আফ্রিকায় সেই সংকট

কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে সংকটটি কী হয়েছিল? মনে করা হচ্ছে সেটি সৃষ্টি হয়েছিল সাধারণভাবে বিশ্বজোড়া একটি ভূতাত্ত্বিক যুগ-পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে। এখন থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে দীর্ঘ মায়োসিন যুগ শেষ হয়ে শৈত্য প্রভাবিত নতুন যুগ প্লায়োসিন শুরু হয়েছিল। এর ফলে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল এবং ইউরোপ-এশিয়ায় নেমে এসেছিল অনেক বেশি ঠাণ্ডা, যার প্রভাব আফ্রিকার উষ্ণতর অঞ্চলেও দেখা দিয়েছিল। পূর্বের মায়োসিন যুগে বিভিন্ন প্রজাতির এইপের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল– বিশেষ করে আফ্রিকায়। তারই বেশকিছু বাস করত পূর্ব আফ্রিকার রিফ্‌ট ভ্যালী (বিভাজন উপত্যাকা) অঞ্চলে। বেশিরভাগ কেনিয়াতে অবস্থিত এই রিফ্‌ট ভ্যালী উত্তর-দক্ষিণ যথেষ্ট দীর্ঘ একটি নিচু অঞ্চল যার প্রশস্ত তা কিন্তু বেশি নয়– গড়পড়তা ৮০ কিলোমিটার মাত্র। আশপাশের অঞ্চল থেকে এটি গড়পড়তা ৩০০ মিটার নিচু, যে কারণে আফ্রিকার পূর্বের অঞ্চলকে এটি পশ্চিমের অঞ্চল থেকে কিছুটা বিভাজিত করে রেখেছিল। সেজন্যই এর নাম বিভাজন উপত্যকা। এর অতি ঘন বনে সে সময় সমাবেশ ঘটেছিল বিভিন্ন ধরনের এইপের সমৃদ্ধ আবাসের। বনের ফঁকে ফাঁকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ছিল বলে এদের একের আবাসের সঙ্গে অন্যের আবাসের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছিল। জলবায়ুগত যুগ পরিবর্তনে এখানে শুষ্কতা দেখা দিল, এর কোথাও কোথাও ঘন বন টিকে রইল টুকরো টুকরো খণ্ডে, যেগুলো পরিবেষ্টিত হয়ে রইল বড় বড় তৃণ ভূমির দ্বারা। অবশ্য এ তৃণভূমিতে যথেষ্ট দূরে দূরে কিছু গাছপালাও ছিল।

এরকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রিফ্‌ট ভ্যালীর বিভিন্ন এইপ গোষ্ঠীর প্রাণীদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল। তাদের কেউ কেউ ঐ সংকুচিত হয়ে যাওয়া ঘন বনের গহীনে ঢুকে গিয়ে সেখানেই আগের মতো বৃক্ষ শাখার আশ্রয়ে থাকতে লাগল। তাদের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রা আগের মতই রইল, সংকটাপন্ন হলো না। তাদের উত্তরসূরিরাও আগের মতো একই এইপ হিসাবেই থেকে গেল। কিন্তু তাদের অল্প

কেউ কেউ বিস্তৃততর খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে আসল– এবং সেই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করল। যারা এই দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিল তাদের মধ্যেই একটি এইপের কোনো গোষ্ঠীতে দুই পায়ে বেশি স্বচ্ছন্দে চলার মতো একটি বড় পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল। দেখা গেল কালক্রমে ঐ রকম পরিস্থিতিতে এই দুই পায়ে চলা এই এইপই নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারল বেশি– কারণ দ্বিপদী হওয়ার বেশ কিছু সুবিধা উন্মুক্ত তৃণভূমি অঞ্চলে রয়েছে। এতে মাথা উঁচুতে থাকে বলে অনেক খানি বেশি দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়– আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে চার পায়ের চেয়ে কম শক্তি ব্যয় করতে হয়- চলাচলের দক্ষতা বেশি হয়। চলার কাজে হাতের প্রয়োজন না হওয়াতে সেটি অন্যান্য নানা উন্নত কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠল– যেমন খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষার্থে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপে, খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস বহন করে আনা ইত্যাদি কাজে। এভাবে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তারা বৃক্ষ ও তৃণভূমি উভয়ের সুযোগ কাজে লাগাতে পারল। তখনো গাছে উঠে শাখায় ঝুলে চলার অভ্যাস বজায় রেখেও তারা দুই পায়ে হাঁটার সুবিধাগুলোও নিতে থাকল। পরিস্থিতির সংকটে এমনিভাবে বিবর্তিত হয়ে তারা আগের এইপ অবস্থা থেকে মানব-সদৃশ প্রথম প্রজাতিতে পরিণত হলো।

লুসির আবিষ্কার

দ্বিপদী হওয়ার মাধ্যমে মানব-যাত্রার এই যে প্রথম উল্লম্ফন এ সম্পর্কে মতো কথা আমরা বলছি কীভাবে? এক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ফসিল পাওয়ার মাধ্যমেই এই ধারণাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাচীন ফসিল পাওয়া যায় হঠাৎ হঠাৎ– দৈবাৎ, খুবই বিরলভাবে। রিফ্‌ট ভ্যালী অঞ্চলে এবং অন্যত্র এরকম যাও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছিল তার অধিকাংশ থেকে খুব বেশি কিছু বুঝার উপায় ছিল না। কারণ বেশির ভাগ ফসিলগুলো ছিল কঙ্কালের ছিটেফোঁটা মাত্র। কোথাও মাথার খুলির একটু অংশ, কোথাও অর্ধেকটি চোয়াল, কোথাও দুটি দাঁত ইত্যাদি। তার থেকেই কিছু ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল প্রথম মানব-সদৃশ নতুন প্রজাতিগুলোর অগ্রযাত্রার।

১৯৭৪ সালে পূর্ব আফ্রিকায় ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে একটি ফসিলের আবিষ্কার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিল। এখানে পাওয়া গেল সেই আদি মানব-সদৃশ প্রজাতির অনেকটা সম্পূর্ণ একটি কঙ্কাল ফসিল। না পুরো কঙ্কাল নয় তবে তার ৪০%, যার থেকে পুরো কঙ্কাল সম্পর্কেই ধারণা করা সম্ভব হচ্ছিল। মানুষের ধারা আর আজকের অন্যান্য এইপের ধারার মধ্যে অতীতের যে হারানো সংযোগ (মিসিং লিঙ্ক) কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না– মনে হলো এবার তাকে পাওয়া

গেল। কারণ এতে উভয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এ ফসিলের সময়কাল বুঝা গেল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর। রাতারাতি দুনিয়াজোড়া বেশ জনপ্রিয়তা পেল প্রায় ২৫ বছর বয়সী এই স্ত্রী ফসিল এবং তার নাম রাখা হলো লুসি। সেই ১৯৭৪ সালে বীটলরা তখনো সঙ্গীতের জগতে তুঙ্গে। তাদের একটি বিখ্যাত গানের কলি 'লুসি ইন দি স্কাই উইথ ডায়মন্ড' থেকেই লুসি নামটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

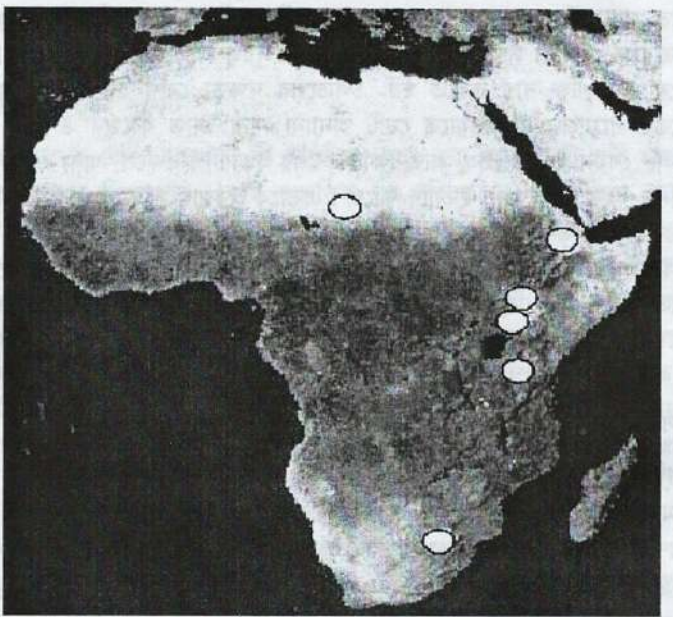

পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকায়
মানব-উদ্ভবের প্রথম যুগের (৫০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগের)
গুরুত্বপূর্ণ ফসিল প্রাপ্তিস্থানসমূহ

লুসির পরিচয়

লুসি এমন সময় আবিষ্কৃত হয়েছে যখন ফসিল বিশ্লেষণের ও তার থেকে তথ্য পাওয়ার বিজ্ঞান অনেক বেশি উন্নত। তাই এর মাধ্যমে শীঘ্রই লুসির একটি বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া গেল এবং একই সঙ্গে তার কিছু আগেপরের ও সমসাময়িক আদি-মানব-সদৃশদের পরিচয়ও। পরিষ্কার বুঝা গেল, লুসি স্বচ্ছন্দে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। খাড়া হলে তার হাঁটুর কব্জা যেভাবে পুরো লক্ হয়ে

আটকে যায় এবং তার কটিদেশের যে গঠন, তাতেই ব্যাপারটি বুঝা যায়। তার পায়ের পাতাও মানব-সদৃশ। বলতে গেলে লুসির এগুলোই প্রধান এবং প্রায় একমাত্র মানব-সদৃশ দিক। লুসির যে প্রজাতি তার নাম দেওয়া হয়েছে *অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস*। নামের প্রথম অংশের অর্থ দক্ষিণের নর-বানর, দ্বিতীয় অংশ এসেছে যেখানে সে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই আফার অঞ্চলের নামে। তার দেহ খুব ছোট। এর কারণ এইপের একটি বৈশিষ্ট্য এই মানব-সদৃশ প্রজাতিতেও থেকে গেছে– সেটি হলো পুরুষের তুলনায় স্ত্রীরা অনেক ছোট হওয়া।

এটি পরবর্তীকালের মানব-সদৃশদের মধ্যে তেমন করে আর ছিল না। তাছাড়াও বাকি প্রায় সবগুলো বিষয়ে লুসির সাদৃশ্য বর্তমান মানুষের চেয়ে সনাতন এইপের সঙ্গেই বেশি। ওদের মতোই লুসির পা ছোট, সে তুলনায় হাত লম্বা। হাতের গঠন দেখে বুঝা যায় খোলা জায়গায় দ্বিপদী হয়ে হাঁটলেও গাছে গাছে ঝোলার কাজে তার হাতের ব্যবহার ছিল। হাত পুরো মুক্ত ছিল না বলে সব সময় বাচ্চা কোলে নেওয়া হতো না। ছোট বাচ্চারা মায়ের পশম ধরেই গায়ে আকড়ে থাকত– পশম তাদের তখনো লম্বা। পাঁজরের আকৃতি উপর থেকে নিচের দিকে ক্রমে প্রশস্ত হয়ে যাওয়া– যা লম্বা অন্ত্র থাকারই লক্ষণ– অন্যান্য এইপের মতো। প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ খেতে ও হজম করতে হয় বলেই এ রকম দীর্ঘ অন্ত্রের প্রয়োজন। লুসির সময় মানব-সদৃশরা পুরাপুরি উদ্ভিদভোজীই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো পরবর্তী কালে মানব বিবর্তনের বড় লক্ষণ মস্তিষ্কের আকার তখনো খুবই ছোট রয়ে গেছে। লুসির মাথার খুলির থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তার মস্তিষ্কের আকার ৪৪০ সিসির (কিউবিক সেন্টিমিটার) বেশি নয়। আমাদের প্রায় ১৩৫০ সিসির তুলনায় এটি রীতিমতো ছোট তো বটেই পরবর্তীকালের অন্যান্য মানব-সদৃশদের

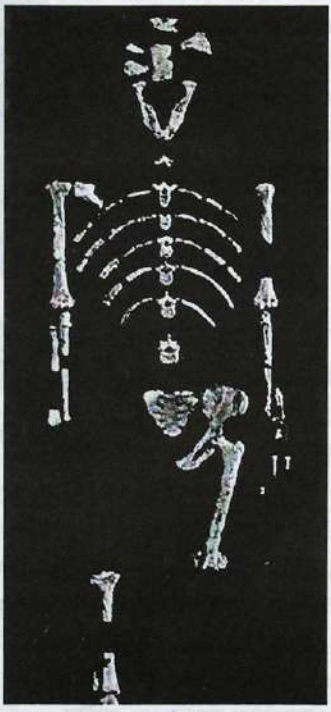

লুসি
(অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস)
৩৫ লক্ষ বছর আগের

তুলনায়ও নেহাতই ছোট, আজকের শিম্পাঞ্জির চেয়ে বড় নয়। তবে লুসির দাঁতের ও চোয়ালের গঠনে মানব-সদৃশ ভাবটি ইতোমধ্যেই দেখা গিয়েছিল। চোয়াল সামনের দিকে বের হওয়া নয়, মানুষের মতো চাপা এবং মসৃণতর।

লুসি
(ফসিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)

লুসিরও আগে

লুসিই মানব-সদৃশদের প্রাচীনতম নমুনা নয়। প্রায় পূর্ণাঙ্গ ফসিলের কারণে তার সম্পর্কে বেশি জানা গেছে বলেই সে মতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয়। ১৯৯০ এর দশকে ইথিওপিয়াতে পাওয়া গিয়েছে লুসির চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং খুব সম্ভব এ পর্যন্ত পাওয়া মানব-সদৃশদের সব চেয়ে প্রাচীন ফসিল। এটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বছর প্রাচীন। এটি লুসির থেকে ভিন্ন একটি প্রজাতি তো বটেই, তার 'গণ'ও আলাদা– এর বৈজ্ঞানিক নাম *আর্ডিপিথেকাস রামিডাস*। লুসির মতো *অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিসের* চেয়ে এটি আরও ছোটদেহী। এর চোয়াল ও হাতের যে আংশিক ফসিল পাওয়া গেছে, তাতে একেই সচরাচর এইপের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা মানব-সদৃশ প্রাণীর এ পর্যন্ত প্রাচীনতম নমুনা মনে করা যায়। একই রকম বৈশিষ্ট্যের ফসিল হাড় আটান্ন লক্ষ বছর আগের শিলাস্ত

রেও পাওয়া গিয়েছে। তার থেকে এর আরও প্রাচীনত্বের কিছু আভাস মেলে। আর্ডিপিথেকাসের এমন পূর্ণাঙ্গ ফসিল পাওয়া যায়নি যার থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় তারাও লুসির মতো দুই পায়ে হাঁটতে পারত কিনা। তবুও এইপের ধারা আর মানব ধারার মধ্যেকার প্রাচীনতম সংযোগ (মিসিং লিঙ্ক) খুব সম্ভব এই আর্ডিপিথেকাস রামিডাস। ডিএনএ অনুসন্ধানও তো সে রকমই বলছিল– মানবধারার পৃথক যাত্রা শুরুর কাল হিসাবে।

লুসির কালে আসতে আসতে অবশ্য মানব-ধারা বেশ কিছু দিক থেকে সনাতন এইপের থেকে সুস্পষ্ট পৃথক মানব-সদৃশ হয়ে উঠেছিল– বিশেষ করে দুই পায়ে হাঁটার দিক থেকে। এর একটি চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৭৮ সালে মেরী লীকির এক আবিষ্কারে। লুই লীকি, তাঁর স্ত্রী মেরী লীকি এবং তাঁদের ছেলে রিচার্ড লীকি- এঁরা এক বিখ্যাত অনুসন্ধানী পরিবার, প্রাচীন নৃতত্ত্ব যার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। প্রধানত পূর্ব আফ্রিকায় তাঁদের অনুসন্ধানে ও বিশ্লেষণে অনেক ফসিল পাওয়া গিয়েছে যাতে অনেক কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে। টানজানিয়ার লীটিলি অঞ্চল লুসির আফার অঞ্চল থেকে দূরে নয়। এখানে লুসির সমসাময়িক আরও আফারেনসিস ফসিল পাওয়া গিয়েছে, আর এখানেই মেরী লীকি আবিষ্কার করেছেন ঐ সময়ের কিছু মানব পদচিহ্ন।

প্রাচীন পদচিহ্ন

এখানে উপরের শিলাস্তর সরে যাওয়ার ফলে উন্মুক্ত হয়েছিল ৫০ মিটার দীর্ঘ একটি পথে বেশ কিছু প্রাণীর পদচিহ্ন। তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে দুজন মানব-সদৃশের পায়ের ছাপ– দুই পায়ে হাঁটার এবং স্পষ্টত মানব-পদচিহ্ন হবার কারণে যা অন্যগুলোর সঙ্গে আলাদা করে চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সাধারণ এইপের (যেমন আজকের শিম্পাঞ্জির) সঙ্গে মানুষের পায়ের পাতার অনেক তফাৎ। এইপের পা অনেকটা আমাদের হাতের মতো। গোড়ালির কাছে থেকে বুড়ো আঙ্গুলটি বের হয়েছে আলাদা ভাবে– বাকি চার আঙ্গুল কিছুটা সামনে পাশাপাশি একই জায়গা থেকে। মানুষের পায়ে কিন্তু পাঁচ আঙ্গুল পায়ের পাতার একেবারে সামনের কিনারায় একইভাবে পাশাপাশি বের হওয়া। এটি পুরো শরীরের ভার নিয়ে দুই পায়ে হাঁটার উপযুক্ত– হাঁটার সময় একটু স্প্রিং করে যেন সামনে এগুতে পারে সেই রকম– মানুষের হাঁটার নিজস্ব ভঙ্গির সঙ্গে যা খাপ খায়। মেরী লীকের আবিষ্কৃত ঐ পদচিহ্নগুলো অনেকটাই মানুষের মতো– এইপের মতো মোটেই নয়। আর এগুলো এখনকার কারও নয়– বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে, প্রায় ৩৭ লাখ বছর পুরনো– খুব সম্ভব লুসির মতোই দুজনের।

সামান্য কিছু পদচিহ্ন কীভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেল এই ৩৭ লক্ষ বছরের জন্য? তার হদিস পাওয়া গেল কাছেই আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের চিহ্ন থেকে। আগ্নেয়গিরির গর্জনে, তার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে খুব সম্ভব ঐ প্রাণীরা দ্রুত পালাচ্ছিল। ইতোমধ্যে জমা মিহি ছাইয়ের মতো গুঁড়ার উপর দিয়ে যেতে যেতে পদচিহ্ন পড়েছিল। সম্ভবত কিছু পরেই হয়েছিল মৃদু বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির পানিতে ভিজে আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত ঐ গুঁড়া জমে সিমেন্টের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আরও উদ্গীরণের ভস্মে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এই ৩৭ লাখ বছরের জন্য।

প্রথম মানব-সদৃশ পদচিহ্ন
৩৭ লক্ষ বছর আগের
প্রাপ্তি : উত্তর টানজানিয়ার লীটিলি (১৯৭৮)
পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া পুরুষ (বড়) ও স্ত্রী (ছোট) পদচিহ্ন

যে দুজন মানব-সদৃশের পায়ের ছাপ এখানে রয়েছে তার এক জনেরটি অপেক্ষাকৃত বড়, অন্য জনের ছোট। পরীক্ষায় মনে হচ্ছে ছোট জন শিশু নয়– মানবী। আগেই বলেছি লুসির কালে মানবের চেয়ে মানবী বেশ ছোট হতো– এইপের এই বৈশিষ্ট্য তখনো তাদের মধ্যে বজায় ছিল। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রাচীনতম মানব-মানবীর এই পাশাপাশি পদযাত্রা আজকের দিনে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে সবাইকে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। ঐ ৫০ মিটার পথেও তারা একবার থমকে দাঁড়িয়ে একটু পেছনে ঘুরে তাকিয়েছে এমন প্রমাণও পদচিহ্ন থেকে পাওয়া যায়। হয়তো ভয়ে ভয়ে দেখছিল আগ্নেয়গিরির ধ্বংসাত্মক উৎক্ষেপণ এখনো নিরাপদ দূরত্বে আছে কিনা।

লুসির সমসাময়িক ও পরবর্তী মানব-সদৃশরা

লুসিকে আমরা চিহ্নিত করছি *অস্ট্রালোপিথেকাস আফারোনসিস* বলে। এই নামের প্রথম অংশ জেনাস বা গণের নাম। আর দ্বিতীয় অংশ প্রজাতির নাম। একই গণের অন্তর্ভুক্ত একাধিক প্রজাতি থাকতে পারে। লুসির কিছু পরে, এমনকি তার কালেও অনেক দিক থেকে তার মতো কিন্তু কিছু দিক থেকে ভিন্ন অন্য প্রজাতির মানব-সদৃশরা আফ্রিকাতে ছিল। তারও ফসিল-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এমনি একটি শিশুর ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাউং নামে জায়গায়। 'তাউং শিশু' নামে পরিচিত এই ফসিলের খুলির অংশবিশেষ শুধু মিলেছে।

পরে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার আরও নানা জায়গায় একই রকম ফসিল আবিষ্কার হয়েছে। অনেক পরে এদেরকে লুসির সঙ্গে একই গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– *অস্ট্রালোপিথেকাস* রূপে, কিন্তু একই প্রজাতির নয়। এদের প্রজাতিকে বলা হলো *আফ্রিকানাস*। প্রধান অমিল হলো এরা লুসির প্রজাতির মতো হালকা পাতলা নয়– কিছুটা গাট্টাগোট্টা, তাদের চোয়াল কিছুটা ভারী, দাঁত বড়। আসলে লুসির কালে এবং তারপরও বেশ কয়েক লক্ষ বছর এ রকম কয়েকটি প্রজাতির মানব-সদৃশ পাশাপাশি একই সঙ্গে ছিল বলে মনে হচ্ছে, তাদের কোন কোনটি মোটাসোটা বলে তাদেরকে 'রোবাস্টাস' এবং অন্যরা হালকা পাতলা বলে তাদেরকে 'গ্রেসাইল' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মূলত তাদের সবার প্রকৃতি লুসির মতো– তাদের মানব সদৃশতার পর্যায়ও সে রকম। মনে হচ্ছে এর থেকে মানুষ খুব বেশি অগ্রসর হয়নি আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত। অনগ্রসরতার বিষয়টি হলো মস্তিষ্কের আকার এইপের স্তরে থেকে যাওয়া। ব্যাপারটি বুঝার আর একটি উপায় হলো তারা কী ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত

তা দেখে। এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে মনে হয় অস্ট্রালোপিথেকাসদের হাতিয়ার তেমন উন্নত ছিল। শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও আমরা এক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার দেখি– যেমন শত্রুর প্রতি পাথর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করতে, লাঠি হাতে তাড়া করতে, পাথরের উপর রেখে আর এক পাথর দিয়ে বাদাম ভাঙ্গতে, কিংবা আরও সূক্ষ্মস্তরে একটি পাতার নরম অংশ ছাড়িয়ে নিয়ে পাতার কাঠিকে পিঁপড়ার গর্তে ঢুকিয়ে তাতে উঠে আসা পিপড়াগুলোকে চেটে খেতে। অষ্ট্রালোপিথেকাস হাতিয়ার ব্যবহার এর থেকে উন্নত কিছু হলেও তার কোনো নমুনা টিকে নাই। গাছের ডাল, কাঠ ইত্যাদিতে তেমন কিছু তারা গড়ে নিতে পারলেও সেগুলো সংরক্ষিত হতে পারেনি। এইটুকু বলা যায় যে কুড়িয়ে নেওয়া পাথর ব্যবহার করা ছাড়া তারা পাথর দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করতে পারতনা। তবে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে হাতকে অধিকাংশ সময় মুক্ত রাখার ফলে হাতের ব্যবহার তাদের অনেক বেশি হতো– বিশেষ করে দরকারী জিনিসপত্র, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে জমাবার ব্যাপারে। সেই ৩৫ লক্ষ বছর আগে থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত না দেহের ফসিল দেখে, না হাতিয়ার দেখে মানুষের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলা যাচ্ছে না।

বুদ্ধি দিয়ে বাঁচা

ফসিলের পাঠ

প্রাচীন নৃতত্ত্বের অধিকাংশ খবর আমরা এখনো ফসিলের কাছ থেকেই জানি। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ফসিলের পাঠ থেকে এখন আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এটি অনেকটা আজকের অপরাধ-বিজ্ঞানে কঙ্কাল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা তদন্তের মতোই চমকপ্রদ। রহস্য উন্মোচনের আমেজ এখানে আরও ঘনীভূত। কারণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে। উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে– যেমন ফসিল কঙ্কালটি পুরুষ না স্ত্রী তা ফসিলের মুখমণ্ডল অথবা কটিদেশ থেকে সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রী হলে মুখমণ্ডল অধিকতর মসৃণ হবে যা কঙ্কাল থেকেই অনুমান করা যায়। আরও ভালো বুঝা যায়, কটিদেশের বৈশিষ্ট্য দেখে যা স্ত্রী ও পুরুষে যথেষ্ট ভিন্ন। এসব পার্থক্য অবশ্য বয়স্কদের ক্ষেত্রে যত স্পষ্টভাবে করা যায় অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে করা যায় না।

মারা যাওয়ার সময় বয়স কী রকম ছিল তা ফসিল থেকে বের করাটিও খুব কষ্টকর নয়। চোয়াল বা হাঁড় থেকে তা করা যায়। বিভিন্ন হাঁড়ের অগ্রভাগে এপিফাইসেস নামে কিছু নরম অংশ থাকে। বয়স্প্রাপ্তির সময় তা পরিপক্ব হয়ে হাড়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এটি না হয়ে থাকলে বয়স ১৬/১৭ বছরের উপরে হবে না। তবে চোয়ালে দাঁতের পরিস্থিতি থেকেই বয়স আরও ভালো বুঝা যায়। এটি করা হয় চোয়ালে সংলগ্ন সব দাঁতের ছাপ নিয়ে এবং চোয়ালের এক্সরে নিয়ে, দাঁতের গোড়া সম্পর্কে জানার জন্য। পেষণ দন্তগুলো উঠেছে কিনা সেটি দেখার ব্যাপার। সে যুগের মানব-সদৃশদের ক্ষেত্রে প্রথম পেষণ দন্ত আমাদের

চেয়ে একটু আগেই বের হতো– ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে। আর দ্বিতীয় পেষণ দন্ত উঠলে বুঝতে হবে বয়স কৈশোরে পৌঁছেছিল। তৃতীয় পেষণ দন্ত আমরা যাকে আক্কেল দাঁত বলি তা উঠেছে দেখলে বুঝতে হবে যে বয়স আঠারো বা তার উপরে ছিল। আরও বয়স্কদের ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু আলামত দেখে বয়স বুঝা যায়।

ফসিলের বিভিন্ন হাঁড় থেকে শরীরের উচ্চতা, ওজন, নানা অংশের অনুপাত ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়, পুরো কঙ্কাল না পেলেও। এগুলো থেকে চলাচলের ভঙ্গি ইত্যাদিও আন্দাজ করা যায়। হাতের ক্ষেত্রে উর্ধ্ব বাহু ও নিম্নবাহুর অনুপাত এবং পায়ের ক্ষেত্রে উরু ও হাঁটুর নিচের পায়ের অনুপাতটি অনেক তথ্য দিতে পারে। এ দুই অনুপাত বড় হলে শীত সহ্য করার মতো শরীর হয় আর ছোট হলে গরম সহ্য করার মতো শরীর। লুসির সমসাময়িক মানব-সদৃশদের জন্য তখনো যে গাছের শাখায় ঝুলাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝা যায় তার দীর্ঘতর নিম্ন বাহুর দ্বারা।

ফসিল কত আগের

আমরা এখানে অনর্গল সুদূর অতীতের বিভিন্ন সময়ের কথা বলছি– লুসি বেঁচেছিল ৩৫ লক্ষ বছর আগে, অথবা লীটিলির সেই পদচিহ্ন লুসির থেকে প্রাচীন– ইত্যাদি। ফসিল পাঠে একটি কঠিন অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সেটি কোনো কালের তা নির্ণয় করা। সুদূর অতীতের ফসিলের ক্ষেত্রে তা কোনো শিলাস্তরে পাওয়া গেছে সেই শিলাস্তরের বয়স বের করেই ফসিলের কাল অনুমান করা হয়। কাজেই সে ক্ষেত্রে মূল কাজটি হলো শিলাস্তরের বয়স নির্ণয়। তবে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের– যেমন ত্রিশ চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত পুরনো প্রাণীর ফসিলের কাল নির্ণয় করার সরাসরি উপায় রয়েছে- কার্বন ডেইটিং পদ্ধতিতে। এটি বুঝা গেলে আরও অনেক প্রাচীন ফসিলের বয়স নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতিগুলোও বুঝা সহজ হবে।

বিভিন্ন মৌলের পরমাণু একাধিক রূপে থাকতে পারে– যাদেরকে বলা হয় ঐ মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপ। একই মৌল হতে গেলে এদের সব কটিরই একই পারমাণবিক সংখ্যা হতে হবে– যা পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যার সমান। কিন্তু তা হয়েও বিভিন্ন আইসোটোপের বিভিন্ন পারমাণবিক ভর হতে পারে তাদের বিভিন্ন নিউট্রন সংখ্যার কারণে। এই ভর মোটামুটি প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফলের সমান। তাই বিভিন্ন আইসোটোপকে তার পারমাণবিক ভর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। কার্বনের সাধারণ আইসোটোপ হলো কার্বন-১২ (মানে এর পারমানবিক ভর ১২)। কিন্তু আর একটি আইসোটোপ কার্বন-১৪ এর সঙ্গে কিছু

পরিমাণে মিশানো থাকতে পারে। কার্বন-১৪ এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি তেজস্ক্রিয়। এর পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে সব সময় ইতস্ততভাবে কিছু কণিকা ও শক্তি বের হয়ে আসছে তেজস্ক্রিয়ার রশ্মিরূপে। এর ফলে কার্বন- ১৪ ক্রমেই অবক্ষয়িত হচ্ছে। একটি সুনির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে এভাবে এটি অর্ধেক হয়ে যায়। যা থাকে তাও আবার ঐ একই সময় পর আবার অর্ধেক হয়। এভাবে চলতেই থাকে। অর্ধেক হবার এই সময়টিকে বলা হয় অর্ধ-জীবন (হাফ লাইফ)। যে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি অর্ধ-জীবন থাকে। কার্বন-১৪ এর অর্ধ জীবন ৫,৭৩০ বছর। প্রাণীর দেহের একটি উপাদান কার্বন। বেঁচে থাকার সময় জৈব প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে কার্বন নেবার সময় সুনির্দিষ্ট অনুপাতে কিছু কার্বন-১৪ও দেহে সব সময় আসতে থাকে। কিন্তু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কার্বন আসা বন্ধ হয়ে যায়। অন্য কার্বন এরপর অপরিবর্তিত থাকলেও কার্বন-১৪ কিন্তু ক্রমে অবক্ষয়িত হয়ে কমতে থাকে। মারা যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণী দেহে ও কার্বন-১২ ও কার্বন-১৪ এর পরিমাণ কত থাকবে তা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এরপর থেকে কার্বন ১৪ কমতে থাকে বলে এ অনুপাত বড় হতে থাকে। আজকের দিনে এসে যদি এই অনুপাতটি মাপি তা হলে তার থেকে বুঝতে পারব কার্বন-১৪ ইতোমধ্যে কয়বার অর্ধেক হয়েছে। তার থেকে অর্ধ-জীবন অনুযায়ী ফসিলের বয়সটিও জেনে ফেলা হয়। এটি শুধু প্রাণীর নয় প্রানিজ যে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বয়স নির্ণয়ে কাজে আসে।

লুসির বা তার বহু আগেপরের মানব-সদৃশরা মতো প্রাচীন যে তাদের ক্ষেত্রে কার্বন ডেটিং কাজে আসবে না। তবে প্রায় একই প্রক্রিয়ার তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম-৪০ আইসোটোপ থেকে প্রাচীন শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করা যায়। এটি ক্রমে অবক্ষয়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতেজস্ক্রিয় (স্থায়ী) আর্গন-৪০ এ পরিণত হয়। এর অর্ধ-জীবন অনেক দীর্ঘ– ১৩০ কোটি বছর। কাজেই বহু লক্ষ বছর প্রাচীন আগ্নেয়শিলার বয়স তাতে পটাশিয়াম-৪০ ও আর্গন-৪০ এর অনুপাত থেকে মাপা যায়। অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর লাভা থেকে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টির সময় থেকে। ঐ সময় উত্তাপের ফলে লাভা থেকে সব আর্গন উড়ে চলে যায়। কাজেই পরে যে আর্গন-৪০ পাওয়া যায় তার সবই পটাশিয়াম-৪০ এর অবক্ষয়ের ফলেই আসে। অনেকটা এ ধরনের পদ্ধতিগুলোই এখন আরও অনেক উপযুক্ত হয়ে উঠেছে– কাজেই শিলার বয়স এখন আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে মাপা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মাপা যাচ্ছে সেই শিলাস্তরের থাকা ফসিলের বয়সও। কাজটি অবশ্য কখনই খুব সহজ নয়। যেমন আর্গন-৪০ গ্যাস বলে কিছু কিছু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে– যার ফলে পরিমাপে বয়স কম হবার আশঙ্কা থাকে। এরকম সমস্যা উত্তরণের জন্য একাধিক পদ্ধতি দিয়ে বয়স

নিশ্চিত করতে হয়। পরিমাপ পদ্ধতি উন্নততর হওয়ার ফলে গত কয়েক বছরেও প্রাচীন অনেক মানব ফসিলের বয়স আবার কিছুটা নতুনভাবে নির্ণিত হয়েছে, আগের কিছু কিছু ভুল সংশোধিতও হয়ে গেছে। একটি খুব আধুনিক পদ্ধতি হলো জিরকন নামক খনিজের স্ফটিকের মধ্যে সামান্য ইউরেনিয়াম থাকার সুযোগ নিয়ে। ইউরোনিয়াম-২৩৮ অবক্ষয়িত হয়ে জিরকন স্ফটিকের উপর সূক্ষ্ম দাগ একেঁ যায়। এই দাগগুলো গুণে বয়স নির্ণয় করা যায়।

সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত একটি ফসিল

২০০০-২০০১ সালের ইথিওপিয়ার দিক্কা অঞ্চলে একটি আফারানসিস শিশুর ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর থেকে একটু একটু করে এর অংশবিশেষ পাওয়া আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী কয়েক মাসে পুরো কঙ্কালের প্রায় ৫০% উদ্ধার হয়– যেটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা (লুসির ক্ষেত্রেও হয়নি)। ফসিলটি ৩ বছর বয়সী একটি মেয়ে শিশুর– এখন 'দিক্কা শিশু' বলে পরিচিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৩৩ লক্ষ বছর আগের এই ফসিল প্রায় সব দিক থেকে লুসির মতো এবং তার একই প্রজাতির। দিক্কা শিশুর মস্তিষ্কের আকার পাওয়া গেছে ৩৩০ সিসি। বড় হলে এটি লুসির প্রায় সমানই হতো। দুপায়ে হাঁটা, ঝুলার উপযুক্ত হাত, তৃণভূমিও বন উভয় জায়গার উপযুক্ততা– ইত্যাদি সব দিক থেকে এটি লুসির অনুরূপ।

তবে একটি বিষয় দিক্কা শিশুর ফসিল থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, যা লুসির কাছ থেকে স্পষ্ট হয়নি। শিশুটির গলার হাইয়েড হাঁড়টি পাওয়া গেছে যা দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ এইপের অনুরূপ হাড়ের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নাই। যে কারণে তাদের কণ্ঠ ভাষার উপযুক্ত নয়। অস্ট্রালোপিথেকাসদের পক্ষে ভাষার অধিকারী হওয়া যে অসম্ভব ছিল এটি তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

নতুন সংকট, নতুন উত্তরণ

আমরা দেখেছি সচরাচর এইপ ধারা থেকে মানব ধারা রূপ নিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায় পারিবেশিক সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপে। পৃথিবীতে মায়োসিন যুগের শেষে প্লায়োসিন যুগের সূচনাতে দেখা দিয়েছিল সেই সংকট। এরপর প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে এসেছিল আর একটি বড় পরিবর্তন ও সংকট– প্লায়োসিনের শেষ প্রান্তে এসে প্লাইস্টোসিন যুগের হাতছানির সময়। পৃথিবীর পরিবেশের দিক থেকে এটি একটি অস্থিরতার সময় যা পর্যায়ক্রমিকভাবে খুবই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে। আবহাওয়া এক একবার দারুণ শীতল হয়ে পড়ে

কয়েক হাজার বছর ধরে ওরকম থাকছিল। এরকম শৈত্যের সময়ে উত্তরে মেরু অঞ্চল থেকে বরফের চাদর হিমবাহ সব মহাদেশের উত্তর ভাগ ঢেকে দক্ষিণে অনেকখানি নেমে আসছিল। তার প্রভাব আফ্রিকাতেও এসে সেখানে অতিরিক্ত শুষ্কতা সৃষ্টি হয়ে মধ্য আফ্রিকার বনভূমি নষ্ট হয়ে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত তৃণভূমি দেখা দিচ্ছিল। এগুলোকে বলা হয় সাভানা। সেখানকার মানব-সদৃশরা যেভাবে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য বনভূমির ওপর নির্ভর করত তাদের জন্য পৃথিবীর ঐ শৈত্যের সময়টি দারুণ আকাল ও নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে আসছিল। তাদের সংখ্যা কমে গিয়ে অল্প কজনের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পর্যবেশিত হয়ে দারুণ একটি সংকটাবস্থায় চলে আসছিল। এরপর কিছুদিনের জন্য ইউরোপে এশিয়াতে শৈত্য প্রশমিত হলে তার সুফলে আফ্রিকার আর্দ্রতা ও বনভূমি সাময়িকভাবে চাঙ্গা হচ্ছিল বটে, কিন্তু উত্তরের শৈত্য আক্রান্তকাল আবার বার বার ফিরে আসছিল। আর মানব-সদৃশরা বার বার মারাত্মক প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপের সম্মুখীন হচ্ছিল। এরকম বারংবার জলবায়ু সংকটে পড়ার বিরুদ্ধে খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়ায় ওরা দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে এ সময়– প্রধানত মস্তিষ্কের দিক থেকে। সংকটময় অবস্থায় তাদের সহায় হয়েছে বৃহত্তর মস্তিষ্কের মাধ্যমে অধিকতর বুদ্ধির প্রয়োগ। লুসির কালে এবং তারপর দীর্ঘকাল যে মস্তিষ্ক ৪০০ সিসির থেকে বড় ছিল না। বিবর্তিত নতুন প্রজাতির মানব-সদৃশদের ক্ষেত্রে সেটি গিয়ে দাঁড়ালো ৭০০-৮০০ সিসিতে। এ সময়ের কয়েকটি মানব-সদৃশ প্রজাতি দেখা দিয়ে অল্প কিছু দিনের মধ্যে নতুন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়েছে– যাদের সবগুলো সম্পর্কে খুব বিস্তারিত জানা যায় না। তবে মস্তিষ্কের আকারের ও বুদ্ধির দিক থেকে আগের তুলনায় এরা মতো স্পষ্টরূপে উন্নত ছিল যে তাদের নাম দিতে গিয়ে আমরা *হোমো* শব্দটি ব্যবহার করতে কার্পণ্য করছি না। হোমো অর্থ আমরা– অর্থাৎ ওদেরকে 'আমরা' বলতে আমাদের আপত্তি নাই। অথচ এর আগে লুসির বা তার আগে-পরের অন্যান্য মানবসদৃশদের ক্ষেত্রে এই আত্মীয়তা দেখাতে নিজেরা চাইনি– গণের নাম দিয়েছি যেমন অস্ট্রালোপিথেকাস অর্থাৎ 'দক্ষিণের নর-বানর', মোটেই 'আমরা' নয়।

হোমো হাবিলিস

২০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগের সময়ের মধ্যে দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এরকম একটি প্রজাতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা অধিক জ্ঞান রাখি– কারণ এদের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে। এদের নাম আমরা দিয়েছি *হোমো হাবিলিস* যার মোটামুটি অর্থ 'মিস্ত্রী আমরা'। আগের মানব সদৃশদের তুলনায় এরা বেশি কাজের কাজি ছিল বলেই এই নাম। এরা শুধু পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করতনা– সেই পাথরকে কিছুটা সুবিধাজনক আকৃতি দেয়ার চেষ্টাও করত। এটি একটি বড়

পরিবর্তন যা পরবর্তীদের হাতে আরও লাগসই হয়েছে। *হোমো হাবিলিসদের* পাথরের হাতিয়ার নিজের মতো করে নেওয়ার এই যে বিশেষ ধারা এর একটি নামও আমরা দিয়েছি– এটি হলো ওল্ডোয়ান ইন্ডাস্ট্রি! এ ভাবে পরবর্তী অন্যান্য মানব-সদৃশদেরও উন্নতর হাতিয়ার ধারাগুলোর এক একটি ইন্ডাস্ট্রি- (শিল্প) নাম দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার ওলডুভাই নামক এক নিচু জায়গায় *হোমো হাবিলিস* এবং এর আগে পরের অন্যান্য মানবসদৃশদের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে প্রধানত ১৯৬০ এর দশকে। এদিক থেকে এই জায়গাটি বেশ অনন্য। এখানে পাওয়া *হোমো হাবিলিস* ফসিলের একটির জনপ্রিয় নাম সিনডি– একজন তরুণীর ফসিল যার শুধু চোয়াল, মুখগহবরের ওপর দেয়াল, উপরের কিছু দাঁত, খুলির অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়েছে। খুলির ঐ অংশ থেকে মস্তিষ্কের আকারের ধারণা পাওয়া গেছে– ৭০০ সিসি। এখানকার আরও একটি ফসিল *হোমো হাবিলিস* বেশ খ্যাতি পেয়েছিল টুইগি নামে। ঐ সময় ইউরোপে টুইগি নামের একজন মডেল

'টুইগি'
(হোমো হাবিলিস)
১৮ লক্ষ বছর আগের
প্রাপ্তি : টানজানিয়ার ওল্‌ডুভাই (১৯৬৮)

জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। লিকলিকে দীর্ঘকায়া এই মডেলের সঙ্গে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগের ঐ মানবীর সাদৃশ্য কল্পনা করেই এই নাম। তবে হোমো হাবিলিসের ক্ষেত্রেও বড় পুরুষ ও ছোট স্ত্রী হওয়ার এইপসুলভ প্রবণতা বেশ খানিকটা বজায় ছিল। তাই মডেল টুইগির সঙ্গে তার তুলনাটি কিছুটা অতিরঞ্জিত।

সংকটের টানাপোড়েনে এক সফল হোমো

ভূতাত্ত্বিক প্লাইস্টোসিন যুগের শুরু থেকে পৃথিবীতে শৈত্যআক্রান্ত কাল ও শৈত্যমুক্ত কালের পর পর পুনরাবর্তনের যে সংকট চলে এসেছে তার থেকে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর মস্তিষ্কের হোমো মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি আফ্রিকাতে উদ্ভব হতে আমরা দেখেছি। একটি ছাড়া এদের সব কটাই স্বল্পস্থায়ী হয়েছে। শুধু-একটি দীর্ঘকাল টিকে ছিল, বলতে গেলে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই প্রায় ১৭ লক্ষ বছর আগে থেকে মাত্র ষাট হাজার বছর আগে পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ও প্রধানত মস্তিষ্কের আকার একটু একটু আরও বড় হওয়া ছাড়া *হোমো ইরেকটাস* নামের এই মানব-প্রজাতি মোটামুটি এক রকমই ছিল। এটি মানব-বিবর্তনে একটি দীর্ঘ স্থিতাবস্থা (স্টাসিস)। এখানেই প্রজাতিটির সাফল্য। বিভিন্ন ফসিল প্রমাণাদি থেকে যে চিত্র তার পাওয়া যায় তাতে তার বড় ছিমছাম শক্তিশালী ও ঋজুদেহী পরিচয়টি মুখ্য হয়ে উঠে বলেই এই মানব প্রজাতির নাম দেয়া হয়েছে ইরেকটাস বা খাড়া।

হোমো ইরেকটাসের সৃষ্টি যে প্রাকৃতিক সংকট থেকে সেটি আমরা কিভাবে জানলাম? শৈত্যআক্রান্ত কাল ও শৈত্যমুক্ত কালের পর পর আবর্তনে যে পুনরাবৃত্ত সংকট এ সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি ও সময়ের উত্তাপের একটি সুন্দর রেকর্ডের মাধ্যমে। গত ২০ লক্ষ বছরে সমুদ্র- তলে জমা মৃত ক্ষুদ্র প্লাঙ্কটনেই রয়েছে সেই রেকর্ড। সাধারণ অক্সিজেন- ১৬ এর সঙ্গে বাতাস অক্সিজেনের আর একটি আইসোটোপ অক্সিজেন-১৮ সামান্য পরিমাণে থাকে। উত্তাপ যত বেশি হয় অক্সিজেন- ১৮ এর অনুপাতও তত বাড়ে। এটা গ্রহণ করা সে সময়ের প্লাঙ্কটনেও এই অনুপাত রক্ষিত হয়। সমুদ্রতলের জমা কোনো স্তরের মৃত প্লাঙ্কটন কোনো কালের সেটি জানা আছে বলে সেই কালে উত্তাপও এতে অক্সিজেন- ১৮ এর অনুপাত থেকে এখন আমরা জানতে পারছি। এতে প্লাইস্টোসিনের শৈত্যের উঠা-নামা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হোমো ইরেকটাসের সবচেয়ে প্রাচীনতম ফসিলগুলো পাওয়া গিয়েছে ১৯৬০ এর দশকে পূর্ব আফ্রিকায়– সেই ওলডুভাই নিম্নাঞ্চলে। তবে এর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৮৪ সনে কেনিয়ার নারিকোটোম নামক স্থানে– যা

কেনিয়া, সুদান ও ইথিওপিয়ার পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে তুর্কানা হ্রদের পশ্চিম তীরে। যে স্থানে একে পাওয়া গেছে সে শিলাস্তরের বয়স প্রায় সাড়ে পনেরো লক্ষ বছর। আর ফসিলটি হলো একজন বালকের, তাই তাকে নারিকোটোমের বালক বলেই আমরা চিনি। বিশ্লেষণে এটি ইরেকটাসের ফসিল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইরেকটাস সম্পর্কে অনেকটা খবর সাম্প্রতিককালে আমরা তার কাছ থেকেই পেয়েছি।

নারিকোটোমের বালক

লুসির যে ফসিল পাওয়া গিয়েছিল তার মতো অংশ পাওয়া গিয়েছিল যে তার থেকে প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের তথ্যই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর থেকে কিছুটা কম হলেও নারিকোটোমের বালকের ফসিলেরও পূর্ণাঙ্গ হবার মতো যথেষ্ট অংশ পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বালকের বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, উচ্চতা পাঁচ ফুট ৩ ইঞ্চি। এর থেকে মনে হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারলে তার উচ্চতা হতো ৬ ফুটের মতো– আজকের যে কোনো দীর্ঘদেহী মানুষের মতো। সাধারণভাবেও ইরেকটাসরা সুঠামদেহী ও দীর্ঘাঙ্গী বলেই ফসিল সাক্ষ্য থেকে মনে হয়েছে। তাছাড়া হাবিলিসদের তুলনায় তার নাক উন্নত, হাত পা থেকে বুঝা যায় তার দেহ অধিক উত্তাপ সহ্য হবার মতো করেই তৈরি ছিল। শরীরের আর্দ্রতা রক্ষা করতে উন্নত নাক সহায়ক ছিল। তাছাড়া ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে ঠাণ্ডা থাকার প্রয়াসে যে ধরনের দেহ গঠনের প্রয়োজন তার তাই ছিল। মনে হচ্ছে ইরেকটাসে এসে মানুষের শরীরের পশম একেবারে কমে গিয়েছিল– পশমহীন এইপে পরিণত হবার পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম। আরও একভাবে এসবের প্রমাণ মিলেছে। আর্দ্রতা রক্ষার জন্য হাবিলিস ও অন্যান্য মানব-সদৃশরা সাধারণত অধিক সময় ছায়াতে থাকত এবং মনে হয় ভরা দিনে বিশ্রামে থাকত। কিন্তু এই বালকের ফসিল প্রমাণ করে ইরেকটাসের জীবন ধারা ছিল ভিন্ন। তার লম্বা পা, সরু কটি, সুগঠিত বক্ষদেশ দেখে মনে হয় তারা দীর্ঘ হাঁটা, দৌড়ানো, গাছে চড়া, মাটি খোঁড়া– এসব কাজের উপযুক্ত ছিল। এমন ধারার কাজের জন্য পশমহীন দেহে ঘামের ব্যবস্থা থাকা উত্তম। এটিও প্রায় নিঃসন্দেহ যে আগেপরের অন্যান্য সব হোমোর তুলনায় নারিকোটোমের বালকের প্রজাতির দেহাবয়ব বড় এবং সবল– আধুনিক মানুষের চেয়েও। এর অনেকখানি বুঝা গেছে তার হাড়ের গঠন দেখে। এই গঠন নির্ভর করছে শরীরের ওপর কতখানি চাপ বা টান পড়ছে, সেটি কোনো দিক থেকে, কী রকম, তার ওপর। উপর-নিচ চাপ বেশি হলে হাড় খাড়া দিকে মোটা বেশি হবে, সামনে-পিছনের ক্ষেত্রে সেদিকে মোটা হবে, আর সব দিক থেকে সমান হলে সিলিন্ডার আকৃতির হবে।

অবশ্যই ফসিলবিদদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এই বালকের মস্তিষ্কের আকার কত বড়? খুলির সাইজ দেখে এটি নির্ণয় করা হয়েছে ৮০০ সিসি। যে বয়সে সে মারা গেছে, তাতে মস্তিষ্ক তার পূর্ণ আকারে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কাজেই নারিকোটোমের বালকের আমলে ইরেকটাস মস্তিষ্ক হাবিলিসদের থেকে বেশ কিছুটা বড় হয়েছে। অবশ্য ইরেকটাসদের দীর্ঘ স্থিতিকালের মধ্যে পরের দিকে এটি আরও বড় হয়েছিল– প্রায় ১০০০ সিসি পর্যন্ত। বলা যায় বুদ্ধি দিয়ে বাঁচার যে প্রক্রিয়া হোমো হাবিলিস ও তাদের সমসাময়িকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল এটি ইরেকটাসদের মধ্যে আরও সক্রিয় ছিল।

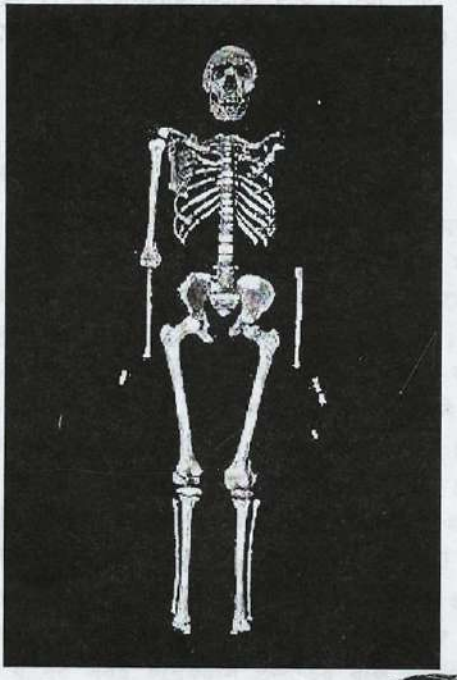

'নারিকোটোমের বালক'
(হোমো ইরেকটাস)
১৫ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগের
প্রাপ্তি: কেনিয়ার নারিকোটোম (১৯৮৪)
বয়স : প্রায় তেরো বছর

মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেলেও আর একটি হিসাবে কিন্তু হাবিলিস ও ইরেকটাসের মস্তিষ্কের মধ্যে তফাৎ খুব বেশি ছিল না। বুদ্ধির দিক থেকে মস্তিষ্কের আকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মস্তিষ্কের আকার আর পুরো দেহের আকারের অনুপাত– যাকে বলা হয় মস্তিকায়ন অনুপাত (এনসেফেলেশন রেশ্যো)। এই অনুপাত যত বেশি হবে অর্থাৎ দেহের আকারের পরিপ্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক যত বড় হবে, বুদ্ধির দিক থেকে এটি তত কার্যকর হবে। বড় দেহে বড় মস্তিষ্কের যতনা কার্যকারিতা, অপেক্ষাকৃত ছোট দেহে ঐ একই আকারের মস্তিষ্ক বেশি কার্যকর। অস্ট্রালোপিথেকাসদের থেকে হোমোদের এই অনুপাত যথেষ্ট বেশি ছিল। তবে হোমো হাবিলিসের পর হোমো ইরেকটাসের মধ্যে এই দিক থেকে বেশি পরিবর্তন হয়নি, অন্তত ইরেকটাসদের প্রথম আমলে হয়নি।

মানুষের প্রথম বিশ্বযাত্রা

জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ, জর্জিয়া মানুষ

হোমো ইরেকটাসই প্রথম মানব প্রজাতি যারা আফ্রিকা থেকে বের হয়ে এসে বিশ্বময় ছড়িয়েছিল। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকবার নতুন মানব-প্রজাতি আফ্রিকাতে বিবর্তিত হয়ে কালক্রমে সেখান থেকে অন্যত্র ছড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আজকের মানুষ– আমরা হোমো সেপিয়েন্সরাও তাই করেছি। কিন্তু হোমো ইরেকটাসই প্রাচীনতম মানুষ যারা আফ্রিকার বাইরে গিয়েছে বিশেষ করে এশিয়ার নানা অঞ্চলে। প্রাচীন নৃতত্ত্ব আজকের মতো এত উন্নত যখন হয়নি সেই ১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে প্রাচীন মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে। খুলির ছাদ, কয়েকটি দাঁত, আর পায়ের একটি হাঁড়– এই টুকুই পাওয়া গিয়েছে। এর থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে এটি যথেষ্ট মানব-সদৃশ কারও ফসিল যার মস্তিষ্ক এইপের থেকে অনেক বড়, মাথার গঠনও মানুষের কাছাকাছি, খাড়া দুপায়ে চলাফেরা করত।

পরে ১৯৩০ এর দশকে ইরেকটাস নামটি দেওয়া হয়েছিল প্রথম একে। পরবর্তীকালে নানা জায়গায় পাওয়া আরও অন্যান্য ফসিলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে যাদের সবই ইরেকটাস প্রজাতির বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাভাতে পাওয়া ফসিল 'জাভা মানুষ' নামে দারুণ খ্যাতি লাভ করেছে। জাকার্তার জাদুঘরে গেলে এখনো সেই ফসিলের সাক্ষাত পাওয়া যায়।

প্রথম দিকে জাভা মানুষের যে সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছিল তা পরে আরও নিখুঁত পরিমাপে বদলাতে হয়েছে। এখন মনে করা হয় এই কাল ১৭ লক্ষ বছর আগে। অর্থাৎ আফ্রিকাতে ইরেকটাসদের উদ্ভবের পর সুদূর জাভাতে গিয়ে পৌঁছতে ইরেকটাসদের খুব অতিরিক্ত সময় লাগেনি।

জাভা মানুষের মতোই খ্যাতি পেয়েছে ১৯২৯ সনে বেইজিং এর কাছে (পূর্ব নাম পিকিং) আবিস্কৃত চোয়ালসহ মাথার খুলির ফসিল– 'পিকিং মানুষ'। পরে

'জাভা মানুষ'
(হোমো ইরেকটাস)
১৭ লক্ষ বছর আগের
প্রাপ্তি : ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে (১৮৮১)

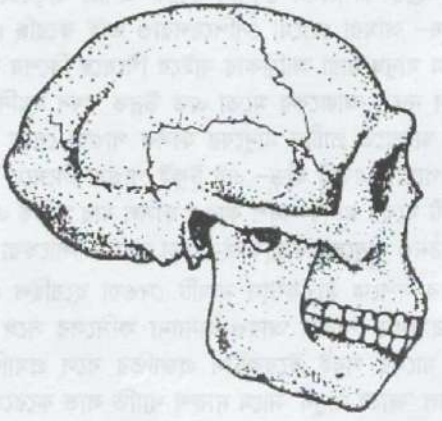

'পিকিং মানুষ'
(হোমো ইরেকটাস)
৫ লক্ষ বছর আগের
প্রাপ্তি : চীনের বেইজিং এর কাছে জোকুডিয়ান (১৯২৯)
মস্তিষ্ক : ১১০০ সিসি

একেও ইরেকটাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে যদিও ৫ লক্ষ বছর আগের এই ইরেকটাস অনেক শেষের দিকের। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি আক্রমণের সময় চীন থেকে এটি হারিয়ে গিয়েছে আর কখনো পাওয়া যায়নি। এই সেদিন ২০০১ সনে প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জর্জিয়াতে পাওয়া গিয়েছে ইরেকটাসের ফসিল 'জর্জিয়া মানুষ'। ১৮ লক্ষ বছর আগের এই জর্জিয়া মানুষকে আফ্রিকার বাইরে পাওয়া প্রাচীনতম মানুষ মনে করা হচ্ছে।

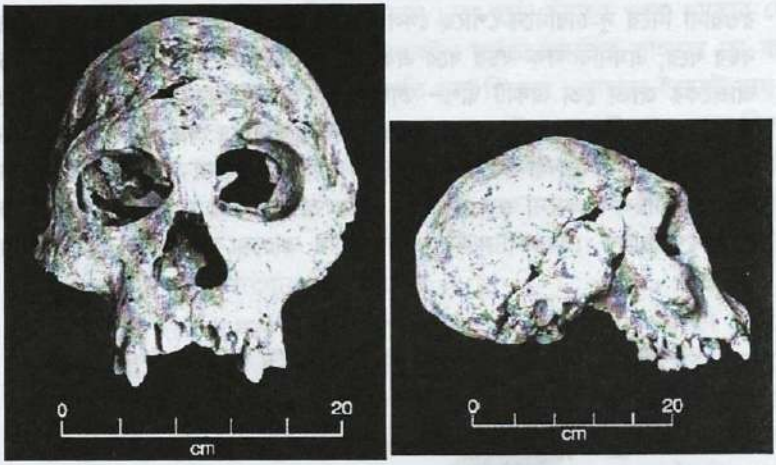

'জর্জিয়া মানুষ'
(হোমো ইরেকটাস)
প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগের
প্রাপ্তি : প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্র জর্জিয়ার দামানিসেতে (২০০১)

ইরেকটাস উদ্ভবের ও আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রথম দিকের এসব ফসিল ছাড়াও পরবর্তী কালের আরও বেশ কিছু আংশিক ইরেকটাস ফসিল আফ্রিকাতে ও এশিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এরা যে সবাই অভিন্ন ইরেকটাস মানুষ সেটি আজ প্রমাণিত– বিশ্বজোড়া একে অপর থেকে অনেক দূরে তারা বাস করলেও। ২০০১ সালে ইথিওপিয়ার ডাকা নামক স্থানে পাওয়া গেছে প্রায় ১০ লক্ষ বছর পুরনো ইরেকটাস ফসিল। একদিকে নারিকোটোমের বালকের সঙ্গে এবং অন্যদিকে বহু আগে অভিবাসী হওয়া এশিয়ার ইরেকটাস ফসিলগুলোর সঙ্গে এর অবাক হবার মতো মিল দেখা যায়। এর মানে

হলো বিশ্বময় ছড়িয়ে নানা অঞ্চলে লক্ষ-লক্ষ বছর আলাদা বাস করলেও ইরেকটাস অন্য প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়নি– ইরেকটাসই থেকেছে।

ইরেকটাসের জীবনযাত্রা

পূর্ব আফ্রিকায় বিবর্তিত হওয়া ইরেকটাস একসময় জাভা বা জর্জিয়ার মতো দূর দেশে গিয়ে পৌছল কেন? এত আজকের পর্য্যটক হিসাবে যাওয়া নয় যে হঠাৎ রওয়ানা দিয়ে দু-চারদিনে পৌছে গেলাম। ছড়িয়ে পড়াটি ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে, এমনকি লক্ষ বছর ধরে একটু একটু করে বংশ পরম্পরায়। তা ছাড়া আজকের জাভা তো একটি দ্বীপ– তাহলে কি ইরেকটাসরা সমুদ্রও পাড়ি দিতে পারত? না, তা নয়। আসলে আজকের পৃথিবীর মানচিত্র আর সেদিনের মানচিত্র এক ছিল না। প্রায়শ দ্বীপাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের কখনো সংযুক্তি আর কখনো বিচ্যুতি ঘটছিল। কোনো এক সংযুক্তির সময় তারা কাছের মূল ভূখণ্ড থেকে জাভা গিয়ে পৌছেছিল। ইরেকটাসদের জীবনযাত্রাই তাদেরকে এভাবে ছড়াতে বাধ্য করেছে।

হোমো ইরেকটাস : প্রথম শিকারি মানুষ
(ফসিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)

প্রথমত ইরেকটাসদের খাদ্যাভ্যাস লক্ষণীয়। অস্ট্রালোপিথেকাসদের খাদ্য যে উদ্ভিজ ছিল যে তা লুসির ত্রিভুজাকৃতি পাঁজর থেকেই বুঝা গিয়েছে– যা দীর্ঘ অন্ত্রের উপযোগী। হোমো হাবিলিসরাও নির্ভর করত প্রধানত বনের ফলমূলের উপর। কিন্তু ইরেকটাসরা ছিল প্রধানত মাংসভোজী (তবে উদ্ভিজ খাদ্যেও অরুচি ছিল না)। এটি নানাভাবে বুঝা গিয়েছে। নারিকোটোমের বালকের সিলিন্ডার আকৃতির পাঁজর এর একটি প্রমাণ– যা অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ অন্ত্রের উপযোগী– মাংস পরিপাকের জন্য যেমনটি হলে চলে। তা ছাড়া দাঁতের ওপর খাদ্যের যে সূক্ষ্ম আঁচড় পড়ে আধুনিক স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে তা বহু গুণে বিবর্ধিত করে তাদের খাবারের প্রকৃতি বুঝা গিয়েছে। তাছাড়া ইরেকটাসদের যে পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে তাও মাংস কাটার বেশ উপযুক্ত। সব মিলে বুঝা যাচ্ছে ইরেকটাসরা শিকারি জীবন যাপন করত। তাদেরকে তাই ছোট ছোট দলে যাযাবরের মতো ঘুরতে হতো শিকারের সন্ধানে। এই শিকারি জীবনই একদিকে তাদেরকে দলবদ্ধ ও সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেছে, অন্য দিকে ক্রমাগত নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

শিকারি ইরেকটাসকে প্রায়শ দ্রুত বেগে শিকার পশুকে অনুসরণ করতে হতো। কিন্তু দ্রুত বেগে থাকা এই পুরো সময় এর প্রতি তাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হতো। এর দিকে ভালোভাবে তাক করা পাথর ইত্যাদি হাতিয়ার ছুড়ে দিতে হতো। এটি করতে পারার জন্য তার নিজের শরীরেই একটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল– যা আগের মানব-সদৃশদের মধ্যে প্রয়োজন ছিল না। এটি হলো দ্রুত গতিতে চলার সময় শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য অন্তঃকর্ণের মধ্যে তরলপূর্ণ বাঁকা নলের সংবেদনশীলতা। আমাদের অন্তঃকর্ণে এই ব্যবস্থা আছে বলেই আমরা দ্রুত গতিতে চলার সময় বা ঝাঁকুনির মধ্যেও মস্তিষ্কের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে ভারসাম্য রাখতে পারি, চোখের সূক্ষ্ম নিবদ্ধতা বজায় রাখতে পারি। এজন্য অন্তঃকর্ণের বাঁকানো নলগুলোর মধ্যে সামনে পেছনের থাকা নল মুখ্য হতে হয়। আমাদের এভাবেই আছে। কিন্তু সাধারণ এইপের মধ্যে এ নলগুলো সেভাবে নাই, তারা ওভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজনে শরীরের অভ্যন্তরের ত্রিমাত্রিক এক্সরে ছবি পাওয়ার জন্য যে ক্যাট (CAT) স্ক্যান করে থাকি একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানব-সদৃশ ফসিলের খুলিতে এই নলগুলোর আভাস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে পূর্বের মানব-সদৃশদের অবস্থা এক্ষেত্রে এইপের মতোই। কিন্তু হোমো ইরেকটাসের মধ্যে এটি প্রায় আমাদেরই অনুরূপ, দ্রুত গতির সময় ভারসাম্য রাখার উপযোগী। এতে হোমো ইরেকটাসের শিকারি জীবনের দেহগত আরও সাক্ষ্য মিলছে।

মস্তিষ্কের মূল্য : অসহায় মানব শিশু

ইরেকটাসের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর মস্তিষ্কের বিবর্তনটাই তার মানব-সদৃশতার ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি। আসলে দুই পায়ে খাড়া হয়ে চলাচল আর মস্তিষ্কের উন্নয়ন– মানুষ হয়ে উঠার ইতিহাসে এই দুইটি বড় মাইল ফলক। প্রথমটির সার্থক সূচনা হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাসদের মধ্যে আর অন্যটির হাবিলিস ও ইরেকটাসের মধ্যে। আমরা দেখব কী ভাবে এই উভয় মাইল ফলকের জন্য মানুষকে বড় রকম মূল্য দিতে হয়েছে।

তার আগে বলে রাখি এই যে, ইরেকটাসের শিকারি ও যাযাবর জীবনকে বরণ– তাও এই মস্তিষ্কের খাতিরেই। বড় মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি এনার্জি– উন্নত ও দক্ষ আমিষ-প্রধান খাদ্য থেকে যার যোগান দিতে হয়। তাই ইরেকটাসকে মাংসভোজী হতে হয়েছে, হাবিলিস বা তারও আগের বন-নির্ভর ধীর গতির জীবন ত্যাগ করে। অবশ্য এই জীবন যাত্রায় মস্তিষ্কের দিক থেকেও যথেষ্ট সহায়তা এসেছে। দক্ষ শিকারি জীবনে ইরেকটাসের সহায়ক হয়েছে সমুন্নত সুঠাম দেহের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর বুদ্ধি। এসেছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা। তাছাড়া এক রকম সামাজিকতা, দলবদ্ধ সমন্বিত কাজ করার সুযোগ এতে এসেছে যা শিকারি জীবনের জন্য খুব দরকার।

অস্ট্রালোপিথেকাসরা যখন দুই পায়ে ভর করে চলতে আরম্ভ করল তখন তার কটিদেশে এর জন্য কিছু পরিবর্তন এসেছিল– যে পরিবর্তনের এখন আমরাও উত্তরসূরি। মাথা ও ধড়ের ওজন নেবার সুবিধার্থে একটি ভালো ভিত্তি তৈরির জন্য জঙ্ঘাদেশকে দুদিক থেকে বাঁকা ও গোল হয়ে বাটির আকৃতি নিতে হয়েছে। এই দুই দেয়ালের মাঝখানে একটি সরু হয়ে আসা পথের মধ্য দিয়েই প্রসবের সময় মানবশিশুকে জন্ম নিতে হয়। যতদিন মস্তিষ্ক তুলনামূলক ভাবে ছোট ছিল ততদিন এতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তাই অস্ট্রালোপিথেকাস সন্তানের জন্মে এটি কোনো বিঘ্ন ঘটায়নি।

অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে নবজাতকের মস্তিষ্ক বয়স্কের মস্তিষ্কের চেয়ে খুব একটা ছোট থাকে না। যতদিন মানব-সদৃশদের মস্তিষ্ক ছোট ছিল তত দিন তাদের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। কিন্তু হোমো ইরেকটাসদের বড় মস্তিষ্কে তেমনটি হলে হাড়ের ঐ সরু পথ দিয়ে তার নিরাপদ প্রসব অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই তার ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটেছে অন্যভাবে– তাদের নবজাতক জন্ম নিল অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে। সেই থেকে আজ অবধি মানুষের এমনটিই হচ্ছে। সে জন্য নবজাতকের

খুলিটার মধ্যেও বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল থাকে শুধু পাতলা নরম অস্থি দিয়ে ঢাকা থাকে যার কিনারা একটির উপর অন্যটি চড়ে বসতে পারে। এর ফলে শৈশবে মস্তিষ্ক আরও বড় ও পরিণত হতে পারে ধীরে ধীরে। নবজাতকের চুলবিহীন মাথার দিকে লক্ষ্য করলেই এটি বুঝা যায়। তাই অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ীর বাচ্চারা যখন ভূমিষ্ঠ হবার পর মুহূর্ত থেকেই হাঁটাচলা থেকে শুরু করে নিজের চেষ্টাতেই অনেক কিছু করতে পারে– সে ক্ষেত্রে অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে মানব শিশু একেবারেই অসহায়। এইপের নবজাতকও দৌড় ঝাঁপ করে মায়ের দুধে ভাগ বসায়, মায়ের পশম ধরে তার পিঠে লটকে থাকতে পারে, নিজের অনেক ব্যবস্থা নিজে করতে পারে– যত্নের অপেক্ষা না করে। অথচ মানব শিশু নিজ থেকে কিছুই পারে না। বড় মস্তিষ্কের জন্য মূল্য দিতে গিয়েই এই অবস্থা। আর মানুষের এই অপরিণত জন্মের সূচনা হয়েছে হোমো ইরেকটাস থেকেই।

নবজাতক অপরিণত মস্তিষ্কের হওয়ার একটি ফলশ্রুতি হলো– ইরেকটাসকে নিবিড়ভাবে শিশু পালনে মনোযোগী হতে হলো। জন্মের পর অনেক দিন দলের সবাইকে এ শিশু লালন পালন করতে হয়, কোলে রাখতে হয়, যত্ন নিতে হয়। এটি করতে গিয়ে ইরেকটাসদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব গড়ে উঠেছিল, মস্তিষ্ক বড় হচ্ছে এমন শিশুকে দুধের পুষ্টি দিতে গিয়ে মা নিজেকেও অনেক বেশি পুষ্টি পেতে হয়েছে, তার দেহ উন্নত হতে হয়েছে। ইরেকটাসের তাই স্ত্রী-পুরুষের দেহের আকারের পার্থক্য অনেক কমে গিয়ে প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল– যা এখন আমাদের মধ্যে বর্তিয়েছে। শিকার ও সন্তান পালন– এই দুটি জিনিস ইরেকটাসদের মধ্যে প্রথম সত্যিকার মানবিক সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করেছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। যে ছোট ছোট দলের মধ্যে থেকে যাযাবর শিকারি ইরেকটাসরা দুনিয়ায় ছড়িয়েছে– সামাজিকভাবে সন্তান পালনের অভ্যাস গড়ে না উঠলে তাদের পক্ষে ওরকম অবস্থায় টিকে থাকা সম্ভব হতো না।

অসুস্থের সেবা

শুধু সন্তান পালনে নয়, ইরেকটাসদের মধ্যেই এমন আরও একটি বিষয়ের আলামত প্রথম দেখা যাচ্ছে যা মানব সামাজিকতার ক্ষেত্রে আরও একটি অনন্য অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। তা হলো নিজেদের মধ্যে অসমর্থ ও অসুস্থকে সেবা দেওয়া, সাহায্য করা। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বেশ নাটকীয়ভাবে। একটি ইরেকটাস অর্ধ কঙ্কাল ফসিল পাওয়া গেছে যে জীবনের শেষের দিকে স্পষ্টত গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিল। খুলি ও কটি দেশের অংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটি ছিল স্ত্রী জাতীয়, দাঁত ও হাঁড় থেকে বুঝা যাচ্ছে– যে এটি পূর্ণ বয়স্কের

ফসিল। অসুস্থতার বাহ্যিক লক্ষণগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা এর হাড়ের পাতলা সেকশন নিয়ে তা অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখেছেন– তা অস্বাভাবিক রকম ঝাঁঝরা। এখনো অতিরিক্ত ভিটামিন-এ জনিত রোগে (হাইপার ভিটামিনোসি) রুগীদের মধ্যে এমন দেখা যায়। এ রোগে রুগী অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অসহায় অবস্থায় কিছু দিন কাটিয়ে মারা যায়। পরীক্ষিত ফসিলে রোগের যে পর্যায় ধরা পড়ছে তাতেও রুগী অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় অন্তত বেশ কিছু মাস বেঁচে ছিল বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এ অবস্থায় অন্যের সেবা ও সাহায্য ছাড়া কয়েক দিনের বেশি বেঁচে থাকা অসম্ভব– কেউ খাইয়ে না দিলে, পানি না দিলে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না দিলে। স্পষ্টত ঘনিষ্ঠরা এ জাতীয় যত্ন দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল– যা একমাত্র মানবিক সামাজিকতার মধ্যেই দেখা যায়।

আসলে অতি ছোট দলে ক্রমাগত অজানা স্থানে শিকারি জীবনে এ রকম সামাজিকতা না থাকলে, পরস্পর সহযোগিতা না করলে ইরেকটাসরা টিকে থাকতে পারত না।

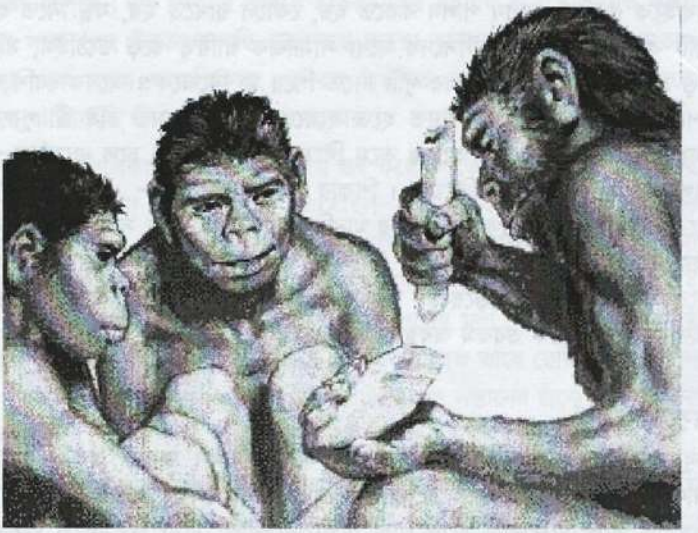

হোমো ইরেকটাস
পাথরকে ধারালো রূপ দিয়ে হাত-কুঠার তৈরি
সামাজিক যত্ন ও যোগাযোগ (ভাষাহীন)

হাতিয়ার ও কৌশল

মানুষ নিজের তৈরি পাথরের হাতিয়ার রেখে গেছে হোমো হাবিলিসদের আমল থেকে। হাবিলিসরা পাথরকে কিনারায় একটু তীক্ষ্ণ বা ধারালো করে নিয়ে অস্ত্র হিসাবে যুৎসই করে নিত। কিন্তু ইরেকটাসদের হাতে পাথরের হাতিয়ার আরও সুন্দর ও জটিল হয়ে উঠেছে। 'আচুলিয়ান ইন্ডাস্ট্রি' নামে পরিচিত এই হাতিয়ারের ধারার পরিচয় মিলেছে ইরেকটাসের নানা ফসিলের কাছাকাছি স্থান থেকে। ইরেকটাসের প্রায় ১৫ লক্ষ বছরের দীর্ঘ কালে তৈরি ও ব্যবহৃত এরকম হাতিয়ারের নিদর্শন সংখ্যা নেহাত কম নয়। এগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো

হোমো ইরেকটাস
পাথরের হাত-কুঠার
১৮ লক্ষ বছর থেকে ৬০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত

এখানে পাথর সরাসরি মুঠ করে ধরে তাকে একটি কুঠারের মতো ব্যবহার করা হতো। এ কুঠারের হাতল লাগানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও এর কাটার অংশ থেকে সযত্নে চল্‌তা তুলে তুলে একে বেশ ধারালো করে তোলা হতো। এই 'হাত-কুঠারগুলো' অধিকাংশ হতো অশ্রুবিন্দুর আকৃতি নিয়ে চোখা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশস্ততর ফলাবিশিষ্ট। এ ছাড়া পাথরের একই চোখা আকৃতির অপেক্ষাকৃত ছোট হাতিয়ারকে বর্শার আগায় ব্যবহার করা হতো বলে মনে করা হচ্ছে। ইরেকটাস ফসিলের কাছে পশু হাড়ে কাটার দাগ দেখে মনে করা হচ্ছে তাদের হাত-কুঠার মাংস ও হাড় কাটতে (মজ্জা খাবার জন্য) ব্যবহৃত হতো। স্বাভাবিকভাবেই মাংসভোজী ইরেকটাসের জন্য এভাবে শিকার করা পশুর মাংস-মজ্জা ইত্যাদি খাওয়ার জন্য সুবিধাজনক করে নেওয়া জরুরি ছিল। তবে একথা ঠিক যে ইরেকটাসদের দীর্ঘকালের তুলনায় হাতিয়ারের বিকাশ যেন এই এক জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে ছিল।

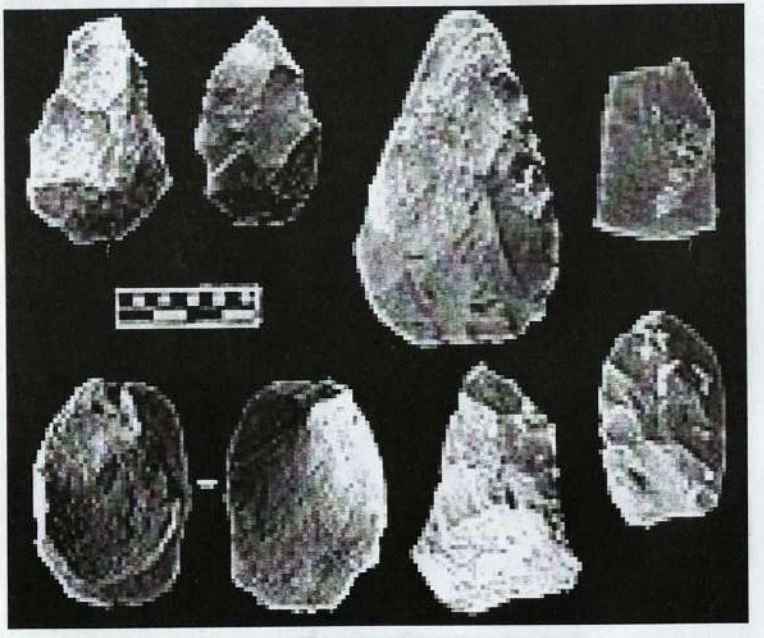

'আচুলিয়ান' হাতিয়ার রীতি
হোমো ইরেকটাসের
বিভিন্ন সময়ের পাথরের হাতিয়ার

ইরেকটাসদের আবিষ্কার করা কৌশলগুলোর মধ্যে শেষ অবধি সব চেয়ে বেশি কাজে এসেছে আগুনের ব্যবহার। মানব বিবর্তনের ইতিহাসে এই বড় ঘটনাটির সূত্রপাতটিও ইরেকটাসের দীর্ঘকালের কোনো একসময় তারাই করেছিল বলে মনে করা হয়। মানুষের আগুন ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে সর্বপ্রাচীন পাঁচ লক্ষ বছর আগের হাঙ্গেরীতে এবং চীনে– রান্নার কাজে। তবে এর বহু আগেই যে ইরেকটাসরা মাংস ঝলসিয়ে খাবার কাজে এবং নিরাপত্তার কাজে আগুন ব্যবহার করেছে তা নিঃসন্দেহ। খুব সম্ভব প্রথম দিকে তারা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট আগুনকে নিয়ে সংরক্ষণ করেছে, ব্যবহার করেছে। বজ্রপাত ও অন্যান্য কারণে তৃণভূমিতে ও বনে দাবানল প্রায়শ ঘটত এবং এ রকম আগুন পাওয়া যেত। এরপর এক সময় তারা নিজেরাই পাথরের ছিদ্রে কাঠের ঘর্ষণে আগুন সৃষ্টি করতে শিখেছে। মাংস ঝলসিয়ে নরোম করে খাওয়ার কারণে তাদের দাঁতের, চোয়ালের গঠনেও কিছু ছিমছাম ভাব আসার সুযোগ ঘটেছে, যা ইরেকটাসের পরবর্তী পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে।

বাকশক্তি কি ইরেকটাসেই এসেছিল

হোমো ইরেকটাসের জীবনযাত্রা, মানসিকতা ইত্যাদি থেকে বুঝা যায় তাদের মধ্যে যোগাযোগের ভালো ও দক্ষ ব্যবস্থা ছিল। তবে বাকশক্তি ও প্রকৃত ভাষা তাদের মধ্যে ছিল কিনা সেটি ফসিলের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমেই অনুমান করতে হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে– ইরেকটাসের এই ক্ষমতা ছিল না। বাকশক্তির জন্য বুকের উঠানামা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে নার্ভ তাকে মেরুদণ্ডের মাঝখানে ছিদ্র দিয়ে যেতে হয়। ফসিলে এই ছিদ্রের আকার দেখে মনে হয় না এই নার্ভের ব্যবহার ইরেকটাসের মধ্যে ছিল। গলার হাড়ের অবস্থান দেখেও বাকশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়নি– যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ইতোপূর্বের অস্ট্রালোপিথেকাসদের মধ্যেও।

তবে বাকনির্ভর ভাষা ইরেকটাসের না থাকলেও ভাষার সৃষ্টির পথে কিছু অগ্রগতি তাদের মধ্যেই হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। আধুনিক কিছু গবেষণা থেকে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি বা PET নামক একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের স্ক্যান করে কোনো পরিস্থিতিতে তার কোনো অংশ উদ্দীপ্ত হচ্ছে তা বুঝা যায়। এটি আসলে করা হয় সেই অংশে রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ নির্ণয় করে। রক্তে মিশিয়ে দেওয়া নিম্নমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বাইরে তেজস্ক্রিয়তা উদ্ঘাটকে পজিট্রন কণিকা নির্গমন মেপেই এটি করা

হয়। আমাদের মস্তিষ্কের PET স্ক্যানিং করে দেখা গেছে যে, কথা বলার সময় মস্তিষ্কের যে অংশ উদ্দীপ্ত হয় হাতের নড়াচড়ার মাধ্যমে ইশারা করতেও সেই অংশই উদ্দীপ্ত হয়। এর থেকে মনে হচ্ছে যে, সীমিত ধ্বনি তোলার সঙ্গে হাতের ইশারা যোগ করে এক ধরনের যোগাযোগের ভাষা ইরেকটাসের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। বৃহত্তর মস্তিষ্ক, হাতের সূক্ষ্ম নড়াচড়ার ওপর মস্তিষ্কের ভালো নিয়ন্ত্রণ পরবর্তী কালে পূর্ণ বাকনির্ভর ভাষার ক্ষমতা অর্জনের পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হোমো ইরেকটাসের আমল থেকেই। এই ক্ষমতা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল পরে আজকের মানুষ হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যে, হয়তো বা তারও খানিক আগে।

প্রায়-জ্ঞানীরা এবং অবশেষে 'জ্ঞানী আমরা'

পরিবর্তন : পৃথিবীর ও মানুষের

পৃথিবীর উত্তর ভাগে বারংবার শৈত্যের কাল আর শৈত্যমুক্ত কালের মধ্যে যে টানাপোড়েন তা কিন্তু গত ২০ লক্ষ বছর ধরে চলতেই থেকেছে। শেষ শৈত্য যুগ লক্ষ বছরেরও আগে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১০/২০ হাজার বছর আগে মাত্র। কাজেই মানুষের ওপর সংকট সৃষ্টির সম্ভাবনা এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপ কিন্তু হোমো ইরেকটাসদের উদ্ভবের পর শেষ হয়ে যায়নি– দীর্ঘকাল কিছুটা কম সক্রিয় ছিল বলা যায়। এর মধ্যে পালাক্রমে তীব্র শৈত্যের সময় একটি ব্যাপার ঘটছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের প্রচুর পানি বরফে পরিণত হয়ে আটকা পড়েছিল। ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা দারুণভাবে নেমে যাওয়াতে আগে যে সব দ্বীপ সরু জলভাগ দিয়ে মূল ভূখণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এখন মধ্যবর্তী অগভীর সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়াতে তাদের মধ্যে স্থল-সেতুর সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময়েই হোমো ইরেকটাসরা অনায়াসে সেই দ্বীপাঞ্চলেও বিস্তৃত হতে পেরেছে। তাদের পরবর্তী প্রজাতির মানুষরাও তা পেরেছে।

তবে অল্পসংখ্যক যারা যেখানে গিয়েছে– মোটামুটি সেখানেই পরবর্তী হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর বসত করেছে। ফলে অভিবাসী মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন কালক্রমে আফ্রিকার ইরেকটাসের সঙ্গে এশিয়ার ইরেকটাসের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে পরিবর্তনগুলো বিচ্ছিন্নভাবে নানা অঞ্চলে নানা নতুন প্রজাতিতে রূপ লাভ করেছে কিনা সেটি বিতর্কের বিষয়। এখন যা বুঝা যাচ্ছে তাতে তেমনটি হয়নি।

এক সময় মনে করা হয়েছে আধুনিক মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়ে মোটামুটি একই রূপ পেয়েছে এবং পরস্পর যৌন প্রজননের মাধ্যমে জিন বিনিময়ের ফলে একই প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। একে বলা হয় 'বহু-অঞ্চল তত্ত্ব'। অবশ্য এই তত্ত্ব আধুনিক গবেষণায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং গবেষণায় যেটি প্রমাণিত হয়েছে তা হলো আফ্রিকাই বরাবরের মতো মানব বিবর্তনের সুতিকাগার থেকেছে। পারিবেশিক সংকটের পুনরাবর্তন আফ্রিকাতেই পাঁচ লক্ষ বছরের মতো সময় আগে আধুনিক মানুষের আরও কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের একাধিক প্রজাতির উদ্ভব করেছিল এখানকার ইরেকটাসের মধ্য থেকে। এদের কোনো কোনোটি সেই সময় আফ্রিকার গণ্ডি ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়া, ইউরোপ এমনকি ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে শৈত্যপ্রধান অঞ্চলেও নতুন করে বিস্তৃত হয়েছিল। আফ্রিকাতে এসব প্রজাতির মানুষের গোড়ার কথা আমাদের বেশি জানা না থাকলেও আফ্রিকা থেকে বিস্তৃত হবার পর এদের কোনো কোনটি কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার বহু ফসিল নমুনা নিয়ে এবং অন্যান্যভাবে গবেষণা সম্ভব হয়েছে।

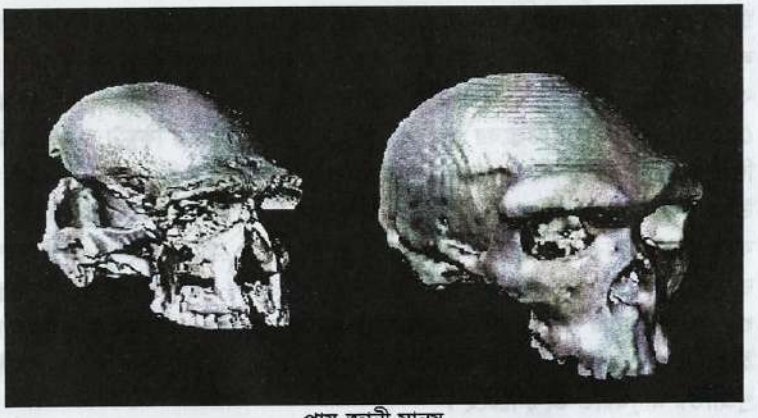

প্রায়-জ্ঞানী মানুষ
(চার লক্ষ বছর আগের)
প্রাপ্তিস্থান : বামেরটি-মরক্কো
ডানেরটি-জাম্বিয়া

নতুন এই প্রজাতিগুলোতে মস্তিষ্কের বিকাশ আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে– বুদ্ধি, কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে তাই তারা আজকের মানুষের অনেক বেশি

কাছাকাছি চলে আসছিল। আজকের *হোমো সেপিয়েন্সের* অনুকরণে তাদের সাধারণভাবে অভিহিত করা হয় আর্কাইক সেপিয়েন্স বলে, অর্থাৎ প্রাচীন ধাঁচের জ্ঞানী। আমরা বরং এখানে তাদেরকে বলি 'প্রায়-জ্ঞানী'।

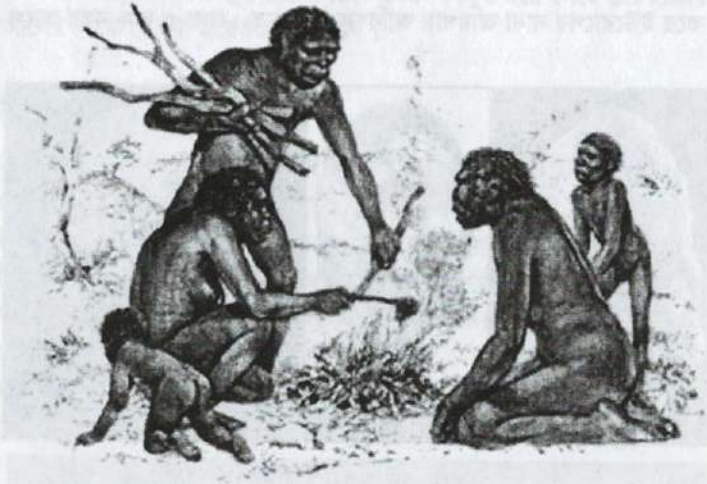

প্রায়-জ্ঞানীদের ঘরকন্না
(ফসিল ও নিদর্শনের ভিত্তিতে চিত্রণ)

আফ্রিকার নানা অঞ্চলে প্রাচীনতম প্রায়-জ্ঞানীদের ফসিল পাওয়া গেছে– ৫ লক্ষ বছর আগের কাছাকাছি সময়ে। এরকম প্রাচীন ভালো ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে মরক্কোতে এবং জাম্বিয়াতে। বর্তমান ডিএনএ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকায় উদ্ভূত প্রায়-জ্ঞানীদের কোনো কোনটি খুব সম্ভব সূয়েজ যোজক দিয়ে মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ইউরোপে। এভাবে ৫ লক্ষ বছর ও এক লক্ষ বছর আগের মধ্যবর্তী সময়ে এক বা একাধিক বড় অভিবাসনে আফ্রিকা থেকে প্রায়-জ্ঞানীরা সেখানে গিয়েছে। সেখানেই কয়েক লক্ষ বছর আগের থেকে তাদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি জানা সম্ভব হয়েছে তাদের একটি অগ্রসর প্রজাতি নিয়ানডার্থালদের সম্পর্কে।

নিয়ানডার্থালদের কাল

প্রায়-জ্ঞানীদের প্রথম ফসিল ইউরোপে পাওয়া গিয়েছে জার্মানির হাইডেলবার্গের কাছে। তাই পশ্চিম ইউরোপের আদিতম মানুষদের নাম দেওয়া হয়েছে হোমো

হাইডেলবার্গেনসিস। কিন্তু জার্মানিরই নিয়ানডার্থাল অববাহিকায় প্রাপ্ত বেশ কিছু ফসিলই সেখানকার প্রায়– জ্ঞানীদের মূল ধারা হিসাব স্বীকৃত হয়েছে। তাই আমাদের সঙ্গে ভালো পরিচিতি হলো *হোমো নিয়ালডার্থালসিস* নামক প্রায়-জ্ঞানী প্রজাতির সঙ্গে যাদের ফসিল ও জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের নানা জায়গায় আবিস্কৃত হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ বছর আগে

হোমো হাইডেলবার্গেনসিস
ইউরোপের প্রাচীনতম প্রাপ্ত প্রায়-জ্ঞানী মানুষ
(প্রামাঝেরটি ফসিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)

থেকে শুরু করে এই মাত্র ৩০ হাজার আগে পর্যন্ত এরকম ফসিল ও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে একই সময়, অন্তত ৬০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত এশিয়ায় হোমো ইরেকটাসদের বংশধররা যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়ে তখনো বিরাজ করছিল, অন্য কোনো মানব প্রজাতি থেকে এই দীর্ঘ সময় বড় কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হয়ে। মজার ব্যাপার হলো এই উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে– মধ্য এশিয়ায় এবং ইউরোপে নিয়ালডার্থালদের সঙ্গে, আর এশিয়ায় সমসাময়িক ইরেকটাসদের সঙ্গে আমাদের প্রজাতির (সেপিয়েন্স) দেখা হয়েছিল। অন্তত কিছু কালের জন্য সেখানে প্রায় সহ অবস্থানই করেছি আমরা তাদের সঙ্গে। স্পষ্টত মানব প্রজাতি হিসাবে আমরা আগে কখনো একা ছিলাম না– একা হয়েছি এই গত ৩০ হাজার বছর মাত্র। এর আগে আমাদের কাছাকাছি অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বাস করছিল। ৩০ হাজার বছর আগে বাকি সবাই বিলুপ্ত হয়ে শুধু আমরা সেপিয়েন্সরাই আছি।

দীর্ঘ ৩ লক্ষ বছর সময়কালের নিয়ালডার্থালদের অন্তত ২৭০ জন পৃথক মানুষের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে– ৭০টি বিভিন্ন খননস্থলে। তারপর ৩০ হাজার বছর থেকে কম প্রাচীন তাদের আর কোনো নিশানা পাওয়া যায়নি। মনে করা হয় এ সময় তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে– যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে ৬০ হাজার বছর আগের দিকে হোমো ইরেকটাসের বংশ।

নিয়ানডার্থালদের চেহারা

সর্বত্র নিয়ালডার্থালদের ফসিল থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট ভেসে ওঠে যে, এরা প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় উদ্ভূত প্রায়-জ্ঞানীদেরই একটি শাখা– যারা ইউরোপের শীতপ্রধান আবহাওয়ায় থাকার মতো করে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সার্বিকভাবে তাদের দেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা দেহাবয়বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেঁটে, ভারী পেশিবহুল গড়ন। আজকের মানুষের কোনো কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে এ গড়ন খুব একটি ভিন্ন নয়– যেমন এস্কিমোদের সঙ্গে। তবে মাথার খুলি এবং মুখাবয়বের গড়নের দিকের কথাটি ভিন্ন।

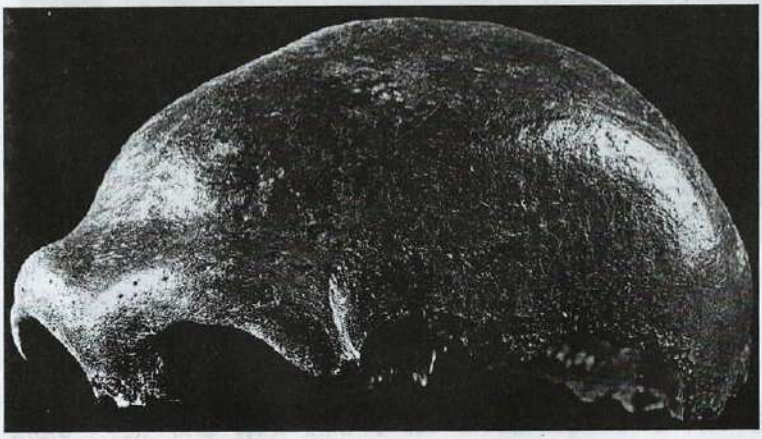

নিয়ানডার্থাল খুলি
(চাপা ছাদ, ভ্রুর স্থানে পুরুত্ব লক্ষণীয়)

আমাদের তুলনায় তাদের কপাল ও মুখ একটু সামনে ঢালু। স্পষ্ট থুতনির বদলে চিবুক পশ্চাৎগামি। নাক বড় কিন্তু চাপা, চোখের ভ্রুর স্থানটা বেশ ফুলা। মাথার

খুলির ছাদটি অপেক্ষকৃত নিচু। খুলির আরও বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো পেছনে স্পষ্ট একটু ফোলা জায়গা– অনেকটা একটি খোঁপার মতো। এসবের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকভাবে পেশি, মেদ ইত্যাদি কল্পনা করে নিলে নিয়ালডার্থালদের যে চেহারা দাঁড়ায় তা যে আজকের মানুষের চেহারার বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে অনেকটা পড়ে যায় না তা নয়। আসলে এমন একজনকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে জনতার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে খুব বেশি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাও নয়। নিয়ালডার্থাল চেহারা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মতো ছবি বা কল্পনা করা হয়েছে যার অনেকখানি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। সে সবে পার্থক্যগুলোকে অতিরঞ্জিত

নিয়ানডার্থাল মানুষ
ফসিলভিত্তিক ধারণা চিত্র
(কয়েক লক্ষ থেকে ৩০ হাজার বছর পর্যন্ত যারা ছিল)

করে তাকে বেশি অদ্ভুত বা বন্য করে দেখাবার একটি চেষ্টা থাকে। তাদের আচরণের ক্ষেত্রেও এরকম অতিরঞ্জিত গণধারণা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু তারা নানা দিক থেকেই আমাদের প্রজাতির মানুষের যথেষ্ট কাছাকাছি। মস্তিষ্কের কথা যদি বলি তা হলে নিয়ালডার্থালদের মস্তিষ্ক আমাদের প্রজাতির চেয়েও বড় ছিল– গড়পড়তা প্রায় ১৬০০ সিসি পর্যন্ত যেখানে আমাদের প্রজাতির মস্তিষ্ক গড়পড়তা ১৪০০ সিসি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমত্তা

তাদের ছিল। কারণ বুদ্ধিমত্তা মস্তিষ্কের আকারের চেয়ে বেশি নির্ভর করে মস্তিষ্কের আকারের সঙ্গে শরীরের আকারের অনুপাতের ওপর। এই অনুপাতটি নিয়ানডার্থালদের চেয়ে আমাদের বেশি। তা ছাড়া মস্তিষ্কের গঠনটি জটিলতর চিন্তার কতখানি উপযোগী সেই বিবেচনায়ও জ্ঞানী আমরা এগিয়ে। তা সত্ত্বেও নিয়ানডার্থালদের প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের সমসাময়িক সেপিয়েন্সদের সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐ সময়টায় নিয়ানডার্থাল ও আমাদের ইতিহাস প্রায় সমান্তরালে এগিয়েছে। আমরা অবশ্য তাদের থেকে দ্রুততর ভাবে উন্নত হয়েছি, আর তারা এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নিয়ানডার্থাল বালক
(ফসিলভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)

শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন

হোমো ইরেকটাসের সময় থেকেই মানুষ শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন যাপন করেছে। তখন থেকেই তারা সাধারণভাবে সর্বভুক ও প্রধানত মাংসভোজী অভ্যাস গড়ে তুলেছে। শিকার করে এবং সংগ্রহ করেই তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটেছে।

এটি ইরেকটাস, নিয়ানডার্থাল এবং আমাদের নিজেদের প্রজাতির– সবার জন্য প্রযোজ্য। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে সাম্প্রতিক মাত্র দশ হাজার বছর ধরে– যখন থেকে আমরা কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে শিখেছি।

নিয়ানডার্থালরাও দলবদ্ধ শিকারি ও যাযাবর জীবন যাপনে করত। বড়জোর ২০/৩০ জনের এই দলের মধ্যেই তাদের যাবতীয় যোগাযোগ সীমাবদ্ধ থাকত। হয়তো অন্য কোনো এরকম দলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতই হতো না দীর্ঘদিন। যাযাবর জীবনে যখন দু-একমাস সময়ের জন্য তারা আশ্রয় তৈরি করেছেথ– তখন সেখানে ফেলে গেছে জীবন যাপনের নানা আলামত। তাদের ফসিল প্রাপ্তির স্থান ছাড়াও এরকম ক্যাম্প করে থাকার জায়গায় পাওয়া নিদর্শনগুলো আবিস্কৃত হয়েছে– যার থেকে এখন কিছু কিছু জিনিস আন্দাজ করা যাচ্ছে। খোলা জায়গায় এই আশ্রয়গুলো তৈরি হতো পশু-চামড়া দিয়ে তৈরি তাঁবু দিয়ে, আর যেখানে গুহা আছে- সেখানে আশ্রয় নিত গুহার ভেতর। শিকার করা পশুর হাড়, শিকারের ও কাটাকুটির হাতিয়ার, ভেঙ্গে মজ্জা খাওয়া হাড়, আগুণ জ্বালানো, পুড়ে খাওয়ার চিহ্ন– এসব নিদর্শনই বেশি। নিয়ানডার্থালদের এরকম ক্যাম্প থেকে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে।

নিয়ানডার্থাল শিকারি
(গবেষণাভিত্তিক ধারণা চিত্র)

আমরা এমন একটি সময়ের কথা বলছি যখন দুনিয়ার তৃণভূমিগুলোতে হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি বড় বড় তৃণভোজী প্রাণীর প্রাপ্যতা বেড়েছে। ইরেকটাস থেকে শুরু করে শিকারি মানুষ দলবদ্ধভাবে এগুলোকে আক্রমণ করার কৌশল বের করেছিল। শুধু তাই নয়, মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, মাংস ও হাড় কাটাকুটি, চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন, তাঁবু তৈরি এসব আনুসঙ্গিক কৌশল ও হাতিয়ার তারা ক্রমান্বয়ে উন্নত করেছে। নিয়ানডার্থালরা এদিক থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, যদিও পরবর্তী সেপিয়েন্সদের মধ্যে এসবে আরও বেশি সৌকর্য এসেছে– কি কৌশলে, কি হাতিয়ারে। উদাহরণস্বরূপ সেপিয়েন্সদের চামড়ায় ছিদ্র করা, তার ভেতরে লতার দড়ি ব্যবহার করে লাঠির সাহায্যে তাঁবু খাড়া রাখার যে দক্ষতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে নিয়ানডার্থালদের মধ্যে তা দেখা যায়নি।

নিয়ানডার্থালদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ অবশ্য ছিল ইউরোপের শীতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকা, সেই শৈত্যের মধ্যে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ বজায় রাখা। এই প্রথম মানুষকে নিয়মিত পোশাক ব্যবহার করতে হয়েছে শীতবস্ত্র হিসাবে। নিয়ানডার্থালদের পোশাক পশু চামড়ায় মোটামুটি গা ঢাকার ব্যাপার ছিল। তা করেই তারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। ইউরোপের যথেষ্ট উত্তরে যেখানে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি সেখানে শীতের বিরুদ্ধে আগুনের ব্যবহারেও তারা বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

দুটি বিতর্কিত ধারণা

তাদের ক্যাম্পিং স্থানের কিছু কিছু নিদর্শন থেকে নিয়ানডার্থালদের সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো নিয়ে এখনো বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্পের স্থানে নানা পশুর ভাঙ্গা হাড় পাওয়া গেছে যেগুলো স্পষ্টত মজ্জা থেকে গিয়ে নিয়ানডার্থালরাই ভেঙেছে। কিন্তু একই সঙ্গে যে জিনিসটি বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পশু হাড়ের সঙ্গে ভাঙ্গা অবস্থায় অল্প নিয়ানডার্থাল হাড়ও ছিল। অনেকে এর অর্থ করেছেন যে, ওরা নিজেদের মৃতদেহও খেত– এমনকি হয়তো খাওয়ার জন্য অন্য নিয়ানডার্থালদের হত্যা করত। এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অবশ্য নানা মতো রয়েছে। কারও কারও মতে এটি শুধু কোনো কোন নিয়ানডার্থাল গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, সবার মধ্যে নয়। সেদিক থেকে তাদের অবস্থা সেপিয়েন্সদের চেয়ে ভয়াবহ কিছু নয়, কারণ একেবারে আধুনিক কালে এসেও আমাদের মানব সমাজেও এই সেদিন পর্যন্ত এরকম মানুষখেকো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল।

অন্য একটি ধারণা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। নিয়ানডার্থালদের কিছু ফসিল কঙ্কাল এমন পরিবেশে এমন জায়গায় আবিস্কৃত হয়েছে যাতে মনে হয়েছে যে তাদেরকে সযত্নে কবর দেওয়া হয়েছে। এর থেকে অনেকে মনে করেন মৃতদেহকে

নিয়ানডার্থাল কবর দেওয়া
(ফসিলের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে ধারণা)

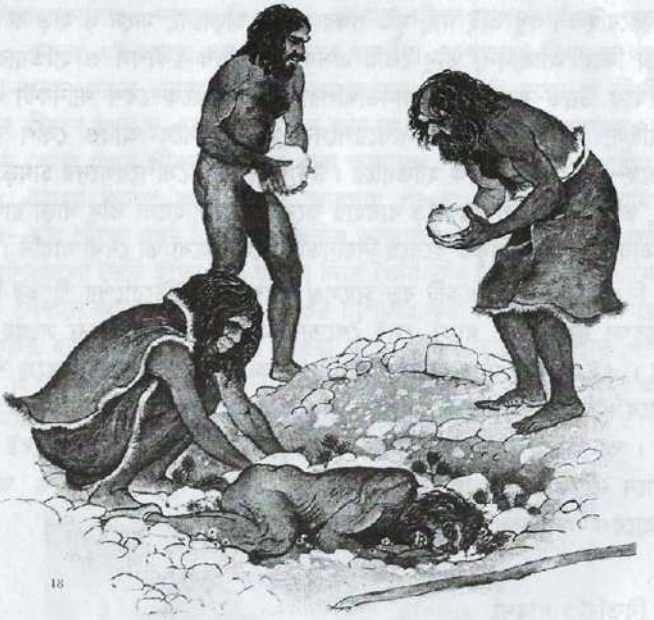

কবর দেওয়ার রীতি নিয়ানডার্থালদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তা হলে নিয়ানডার্থালদের আচার-অনুষ্ঠান, মানবিক গুণাবলি সম্পর্কেও অনেক কিছু আন্দাজ করার অবকাশ ঘটতে পারে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী একে সেভাবে ব্যাখ্যা করতে নারাজ। তাদের মতে এ সব আচার মানুষের মধ্যে এসেছে আরও বহু পরে– হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যে।

নিয়ানডার্থাল হাতিয়ার

আমরা হাতিয়ারের নিদর্শন থেকে এক একটি মানব প্রজাতির মানবিক অগ্রগতি বিচার করার চেষ্টা করে থাকি। অতীত হোমো ইরেকটাসদের পর নিয়ানডার্থালেরা

হাতিয়ারের ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। এর একটি প্রধান দিক হলো ইরেকটাসরা প্রধানত মূল পাথরকে যথাযথ আকৃতি দেবার চেষ্টা করত এর ধারালো দিকটাকে তৈরি করে, একে হাত-কুঠার হিসাবে গড়ে তুলে। এটি করতে গিয়ে পাথরের যে সব ছোট ছোট অপেক্ষাকৃত পাতলা চলতা তারা তুলে ফেলত যেগুলোর ব্যবহারের তেমন চেষ্টা তারা করেনি। নিয়ানডার্থালরা এগুলোর দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিল। এসব পাতলা অথচ শক্ত অংশকে নানা রূপ দিয়ে তারা ছুরি, কোড়ানি ইত্যাদি হিসাবে গড়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যেই এরকম পাতলা ফ্লিন্ট পাথরের হাতিয়ার প্রথম দেখা গিয়েছিল– যেগুলো দিয়ে চামড়া ছিলা, চামড়ার ভেতরের দিক থেকে মাংস পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ অপেক্ষাকৃত সহজে করা যেত। এই দিকটি অবশ্য নিয়ানডার্থালরা খুব বেশি সৌকর্যে নিয়ে

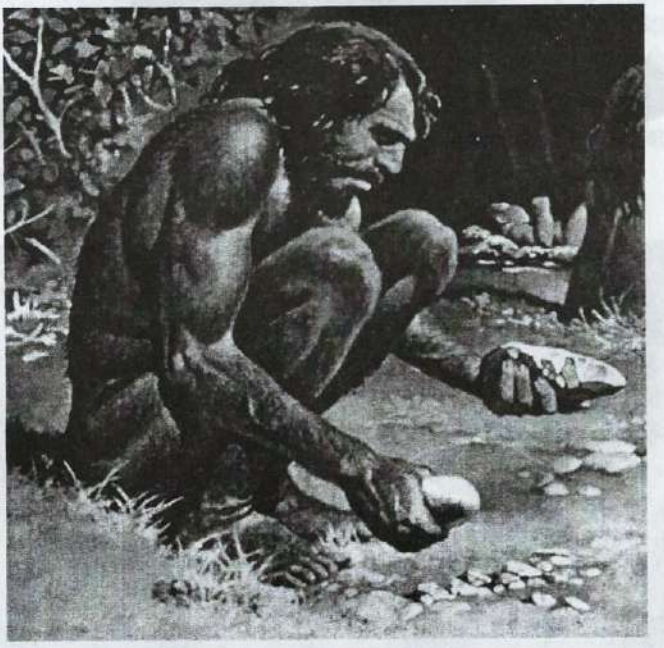

নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ার তৈরি

যেতে পারেনি। ভালো মানের ফ্লিন্ট পাথর বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের পারদর্শিতা ছিল সীমিত। এই সৌকর্যের অভাবেই নিয়ানডার্থালদের তাঁবু তৈরি,

পোশাক তৈরি বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মান পরবর্তী সেপিয়েন্সদের তুলনায় অনেকটা সীমিত মানের ছিল বলেই ধারণা করা হয়।

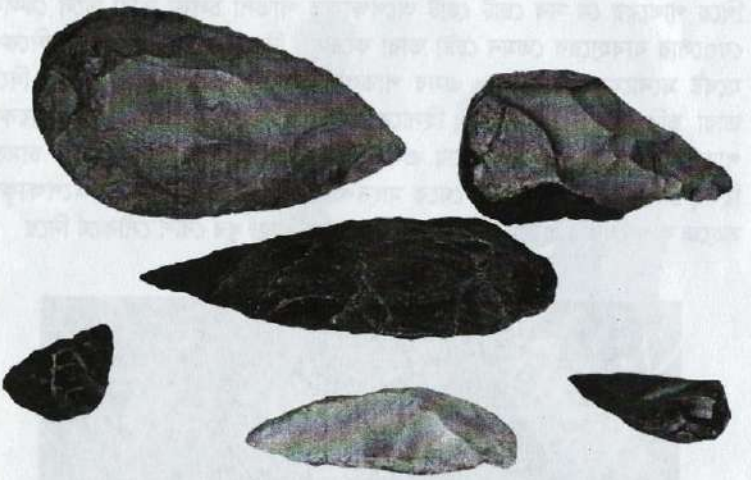

নিয়ানডার্থালদের সৃষ্টি
মাউস্টেরিয়ান হাতিয়ার

অন্যদিকে মূল যে পাথরকে নিয়ানডার্থালরা হাত কুঠার হিসাবে ব্যবহৃত করত তাকে আকৃতি দেবার ব্যাপারে তারা কাঠের ছেনি বানিয়ে বিশেষ কৌশলের সহায়তা নিত- যার ফলে বেশ প্রতিসম এবং কার্যকর হাত-কুঠার সম্ভব হতো। ফ্লিন্টের পাতলা টুকরাকে চোখা করে বর্শার আগা হিসাবে লম্বা সোজা লাঠিতে সংযোজনও তারা বেশ দক্ষভাবে করত বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাছাড়া হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরির নিদর্শনও তাদের মধ্যে প্রথম। নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ার ধারার নাম মাউস্টেরিয়ান ইন্ডাস্ট্রি।

হোমো সেপিয়েন্সের প্রারম্ভ

অগ্রগতির নানা বিবেচনা করলে সেপিয়েন্স মানুষকে নিয়ানডার্থাল মানুষের উত্তরসূরি মনে হতে পারে, কিন্তু নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে জীব বিবর্তনের দিক থেকে তারা তা নয়। আমাদের প্রজাতি সেপিয়েন্সরা আফ্রিকাতে পৃথকভাবেই উদ্ভূত হয়েছে আনুমানিক প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে। হোমো ইরেকটাসের

উত্তরসূরি যে কয়েকটি প্রজাতির প্রায়-জ্ঞানী মানুষ আফ্রিকায় বিবর্তিত হচ্ছিল প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগের সময়ে তারই একটি থেকে নিয়ানডার্থালদের পূর্বসুরিরা উদ্ভূত হয়েছে এবং ৩ লক্ষ বছরের মতো আগে মধ্য এশিয়া, এশিয়া ও ইউরোপে বিস্তৃত হয়ে ধীরে ধীরে সেখানকার আবহাওয়ায় নিজেদেরকে পরিবর্তিত করে খাপ খাইয়ে গড়ে নিয়েছে। একটি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার একটি অংশ যখন ভিন্ন পরিবেশে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর কাটায় তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে জেনেটিক পরিবর্তনে এটি মূল দল থেকে নানাভাবে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে পড়ে। একে বলা হয় জেনিটিক ড্রিফট অর্থাৎ জেনেটিকভাবে সরে যাওয়া। অন্যদিকে ঐ লক্ষ লক্ষ বছর আগেই প্রায়-জ্ঞানীদের অন্য একটি প্রজাতি থেকে আফ্রিকাতেই ক্রমে বিবর্তিত হয়ে দেড় লক্ষ বছর আগে হোমো সেপিয়েন্সরা আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই নিয়ানডার্থালদের বিবর্তন ধারা সেপিয়েন্সদের পূর্বসূরিদের ধারা থেকে পৃথক যাত্রা করেছে সেই ৫ লক্ষ বছর আগে। অবশ্য তা সত্ত্বেও ইউরোপে তারা দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেছে এবং হয়তো তাদের মধ্যে কিছুটা মেলামেশাও হয়েছে। ফসিল প্রমাণাদি থেকে উভয় ধারার উৎস এবং বিকাশের গতি প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তার চাইতেও নিশ্চিতভাবে এসব উদ্ঘাটিত হয়েছে আধুনিক ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে যার কিছুটা আমরা একটু পরেই দেখব।

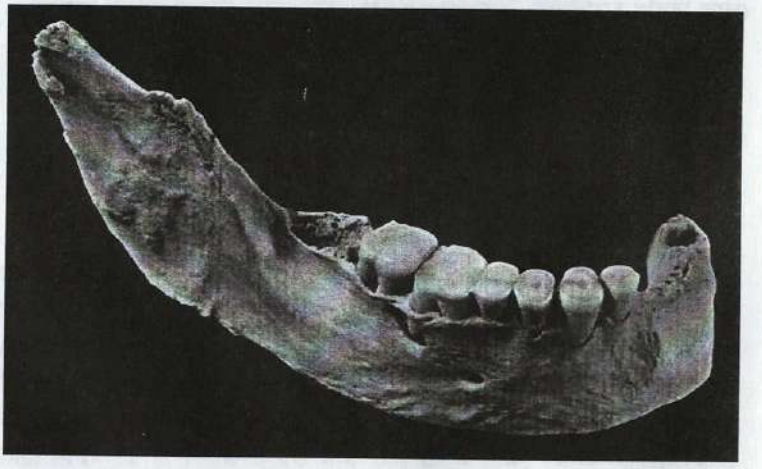

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম
হোমো সেপিয়েন্স চোয়াল
(১ লক্ষ ১৫ হাজার বছর আগের)

এই যে হোমো সেপিয়েন্সের উদ্ভব হলো– আজকের মানুষের সঙ্গে প্রজাতিগতভাবে তারা এক এবং অভিন্ন। কালের প্রভাবে ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে বাহ্যিকভাবে তাদের নানা পরিবর্তন ঘটেছে বটে কিন্তু দেড় লক্ষ বছর আগের সেই প্রথম সেপিয়েন্সরা মৌলিক জেনেটিকভাবে হুবহু আমাদের মতো। কাজেই কোনো জাদুমন্ত্র বলে তাদের কোনো শিশু যদি আজ আমাদের সমাজে এসে উপস্থিত হয় তা হলে তাদের লালন পালন করে আধুনিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। দেড় লক্ষ বছর আগে আজকের এই মানব প্রজাতিটির উদ্ভব হয়েছিল এবং তারপর মোটামুটি একই অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই শেষ অবধি জ্ঞান বিজ্ঞানের জোরে বিশ্বজয় করেছে। কেন উদ্ভব হয়েছিল এই জ্ঞানী মানুষের? এও সেই একই কারণে– পরিবেশের সংকটে সৃষ্ট নতুন আরও কোনো প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপে। এর প্রাচীনতম যে ফসিল পাওয়া গেছে তা এক লক্ষ পনেরো হাজার বছর পুরনো। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথম ফসিল পাওয়া যায়। তারপরের প্রথম কালের সকল সেপিয়েন্স ফসিল আফ্রিকাতেই পাওয়া গেছে। আফ্রিকার বাইরে অন্যান্য পূর্ববর্তী প্রজাতি সমূহের মানুষের বহু ফসিল ও নিদর্শন পাওয়া গেলেও ওখানে যত সেপিয়েন্স ফসিল পাওয়া গেছে তা সবই ৮০ হাজার বছর কিংবা তার থেকে কম পুরনো। মনে করা হয় এই সময়েই কিছু সেপিয়েন্স আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং পরবর্তী ৬০ হাজার বছরের মধ্যে বিশ্বের সব আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অতীতের অন্য সব প্রজাতির মানুষ সব জায়গা থেকে বিলুপ্তি হয়ে গেছে– সেপিয়েন্সরাই শুধু রয়ে গেছে তাদের একাকী রাজত্বে।

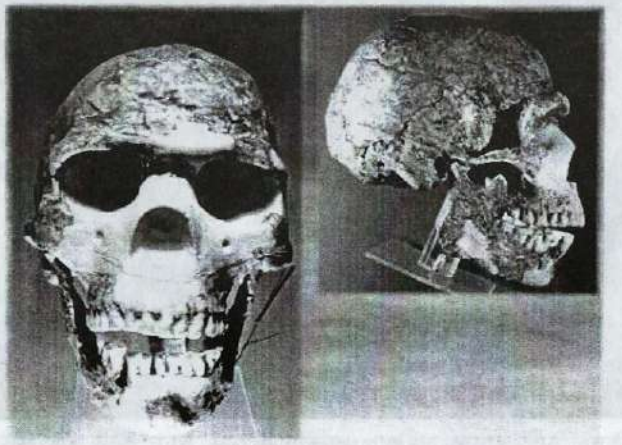

প্রাচীন হোমো সেপিয়েন্স ফসিল
(দেড় লক্ষ বছর আগে থেকে যার শুরু)

পূর্বসূরিদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এমন কোনো অভাবনীয় ঘটনা ছিল না। এমনকি প্রথম কালের হোমো সেপিয়েন্সদেরও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেক সময় ছিল– নেহাত ভাগ্য জোরেই শেষ অবধি টিকে আছি বলা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ তখন মানুষের জন্য অনেক সময় খুবই প্রতিকূল হতে পারত। শুরুর দিকে এমনো অনেক সময় গেছে যখন মানুষের জনসংখ্যা পুরা আফ্রিকা মহাদেশে মাত্র কয়েক হাজারে এসে ঠেকেছিল। সে সময় যদি তারা বিলুপ্ত হতো তা হলে

প্রাচীন হোমো সেপিয়েন্স তরুণ

পরে বিশ্বময় ছড়াবার সুযোগ আমাদের আর হতো না। যে সব ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাদের শিকারি ও যাযাবর জীবনের কথা বলেছি সেগুলো ছোট হয়ে ৫/৬ জনে পর্য্যবেশিত হয়েছিল। এমনো হয়েছে ওরকম একটি দলের সঙ্গে সারা জীবনেও অন্য আর একটি দলের দেখা সাক্ষাত হয়নি। এমন অবস্থায় দুর্যোগে পড়া, বিলুপ্ত হওয়া খুব সহজ ছিল বৈকি। কিন্তু আমরা বিলুপ্ত হইনি। তাছাড়া আমরা বিশ্ব- জোড়া বিস্তৃত হয়েও দীর্ঘ কাল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে মতো বেশি জেনেটিক ড্রিফ্‌টে প্রভাবিত হইনি যে মূল দল থেকে নানা পৃথক প্রজাতি হয়ে যাব। শেষ অবধি আমরা সেপিয়েন্সরা সব সময় একই সেপিয়েন্স থেকেছি।

ইউরোপে প্রথম সেপিয়েন্স

পশ্চিম ইউরোপে সেপিয়েন্সদের প্রাচীনতম ফসিল ৪০-৫০ হাজার বছর আগের- স্পষ্টত তখন ওরা এবং ওখানকার পূর্বতন নিয়ানডার্থালরা একই সঙ্গে একই স্থানে বাস করছিল। প্রথম আবিষ্কারের জায়গার নামানুসারে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোম্যাগনন।

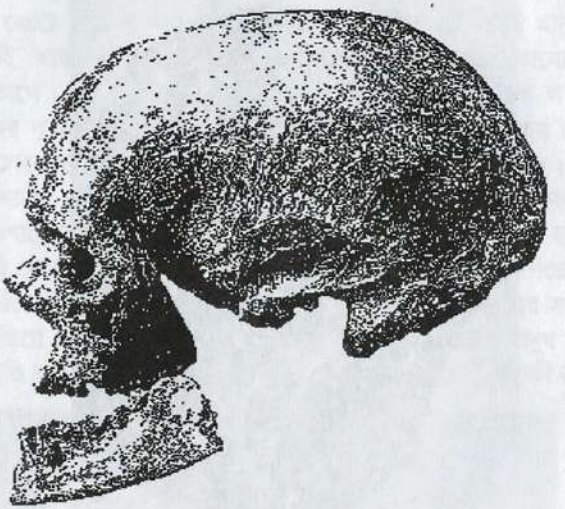

ক্রোম্যাগনন ফসিল
(প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে)
ইউরোপে প্রথম হোমোসেপিয়েন্স

ক্রোম্যাগননরা ইউরোপের একই প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ানডার্থালদের চেয়ে ভালোভাবে মোকাবিলা করেছে তাদের উন্নততর মস্তিষ্ক দিয়ে। তাদের হাতিয়ার এক পর্যায়ে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল– এমনকি তাদের অন্যান্য সব মানবিক গুণও। তাদের পোষাক একইভাবে চামড়া দিয়ে তৈরি হতো বটে, কিন্তু নিয়ানডার্থালদের মতো তারা কোনো রকমে চামড়াকে গায়ে চাপিয়েই সন্তুষ্ট থাকত না, মাথা ঢুকাবার জন্য হাত ঢুকাবার জন্য ছিদ্র করে, সেলাই করে গায়ের সঙ্গে আটসাট করে এক রকম পোষাক বানিয়েই পরত– এ কাজে তাদের সূক্ষ্ম হাতিয়ার থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই

করতে পারত বলে সর্বশেষ বরফের যুগেও ওরা ইউরোপে যথেষ্ট উত্তরাঞ্চলে টিকে থাকতে পেরেছে। আর এ সময় নিয়ানডার্থালরা ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে– স্পেনে, দক্ষিণ ফ্রান্সে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ত্রিশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত নিয়ানডার্থাল আর ক্রোম্যাগননরা এখানেই তাদের সহ-অবস্থানের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছে।

এই অবস্থাতেই প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে এক সময় নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে– ক্রোমেনিয়নদেরকে একমাত্র মানুষ হিসাবে ইউরোপে রেখে। একইভাবে তারও আগে আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে সেপিয়েন্স ছাড়া বাকি সব মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। তার পর থেকে আমরাই একমাত্র মানুষ।

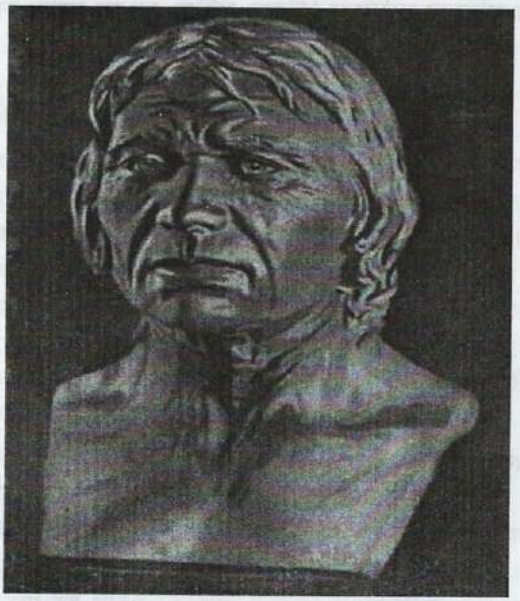

ক্রোমেনিয়ন মানুষ
(আবিষ্কারের পর প্রাথমিক ধারণা চিত্র)

একটি ভাবনা সবার মধ্যে রয়েছে– নিয়ানডার্থালরা কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। হয়তো সেপিয়েন্সরাই এর কারণ। তাদের অধিকতর বুদ্ধি ও ক্ষমতা নিয়ে আগ্রাসী হিসাবে তারা অন্য গোষ্ঠীকে হয়তো টিকতে দেয়নি। হয়তো বরফযুগের তীব্র প্রতিকূলতা

নিয়ানডার্থালরা সহ্য করতে পারেনি। এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো কলাকৌশল স্পষ্টত তারা লাভ করতে পারেনি।

আমাদের সবার মধ্যে আরও একটি কৌতূহল থাকে ইরেকটাসরা, নিয়ানডার্থালরা অথবা প্রথম যুগের সেপিয়েন্সরা আসলে দেখতে কী রকম ছিল। এ সম্পর্কে আগে যে ছবিগুলো ফসিলের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হতো সেগুলো তত নিখুঁত ছিল না। তাই নিয়ানডার্থালদের পাশাপাশি সে সময়ের ক্রোম্যাগনন মানুষের যে ছবি খাড়া করা হয়েছে– সেটিই এক রকম ক্লাসিক ছবি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হয়েছে। হয়তো এতে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে– বেশি সুপুরুষ হিসাবে দেখাবার প্রয়াস আছে ইউরোপীয়দের এই সাক্ষাত পূর্বসূরিদেরকে। আজকাল উন্নততর বিজ্ঞান আর কম্পিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে অতীতের মানুষের চেহারা ও দেহাবয়ব তার ফসিলের কাঠামোর ভিত্তিতে ফুটিয়ে তোলার মডেল নির্মাণ পদ্ধতি আরও অনেক বেশি নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত হয়েছে।

ডিএনএ দিয়ে অতীতকে জানা

মাইটোকোন্ড্রিয়াল আদিমাতা অফ্রিকায়

মানুষ হিসাবে আমাদের সাক্ষাত পূর্বসূরি কারা, কোথায় ছিল তারা, অন্যান্য প্রজাতির মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী রকম ছিল– এ সব নিয়ে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। এসব ব্যাপারে ফসিল গবেষণার মাধ্যমে আমরা আগেও বেশ কিছু বিষয়ে জানতাম- এবং সে জ্ঞান নতুন নতুন ফসিল ও নিদর্শন আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্রমেই আরও সঠিক হচ্ছিল, এখনো হচ্ছে। তবে মাত্র গত দুই তিন দশকের মধ্যে ডিএনএ ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এ সব ব্যাপারে আমরা আরও অনেক বেশি নিশ্চিত হতে পেরেছি। এই গবেষণা এখন প্রাচীন নৃতত্ত্বকে অনেকটা নিখুঁত একটি বিজ্ঞানে পরিণত করেছে।

আগেই বলেছি আজকের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আজকের সব মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ দেড় লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়েছিল। বিষয়টি এখন আরও একটু স্পষ্ট করতে চাই। আমাদের প্রত্যেকটি দেহকোষে লজেন্স আকৃতির অনেকগুলো ছোট ছোট জিনিস আছে যাদের বলা হয় মাইটোকোন্ড্রিয়া। এদের প্রধান কাজ কোষের জন্য শক্তি তৈরি করা। আমাদের বংশগতির ব্লু-প্রিন্ট হিসাবে পরিচিত প্রধান ডিএনএগুলো আছে কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের মধ্যে সাজানো। তবে রিং আকারে অল্প কিছু ডিএনএ মাইটোকোন্ড্রিয়াতেও রয়েছে যা সেভাবে তেমন কাজে লাগে না। তবে এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ'র একটি মজার গুণ রয়েছে– তা হলো মায়ের গর্ভে ডিম্বকোষ বাবার শুক্র কোষ দিয়ে নিষিক্ত হবার সময় ডিম্বকোষের মাইটোকোন্ড্রিয়া থাকে, কিন্তু শুক্রকোষের মাইটোকোন্ড্রিয়া শিশুর ভ্রূণের মধ্যে যায়

না, বাদ পড়ে যায়। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে আমাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ পেয়ে থাকি শুধু মায়ের কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে নয়। ক্রোমোজোমের ডিএনএ বাবা ও মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অংশের নানা মিশ্রণে প্রতি প্রজন্মে নতুন নূতন সমাহার হতে থাকে- মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএথ– 'তে তা হবার সুযোগ নাই। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেকের দেহকোষে যে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ আছে তা প্রত্যেক পেয়েছি তার মা থেকে, মা পেয়েছে নানী থেকে, নানী পেয়েছে তার মায়ের থেকে– এমনিভাবে মায়ের ধারায় তার আদিতম নারী-পূর্বসূরি থেকে- অবিমিশ্রভাবে একই ডিএনএ। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময়ে কপি করার ভুলের কারণে অল্প কিছু পরিবর্তন মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ-তেও ঘটে। কিন্তু প্রতি প্রজন্মে কতখানি পরিবর্তন ঘটবে তার হিসাব রয়েছে। অতীতে এক পর্যায়ে গিয়ে আপনার ও আমার সাক্ষাত নারী পূর্বসূরি যখন একই মহিলা ছিলেন তারপর থেকে প্রতি প্রজন্মে আমাদের নারী-পূর্বসূরিদের এই ডিএনএ একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে দুই ধারার মধ্যে কিছুটা ভিন্ন হতে থেকেছে। তাই আজ আপনার ও আমার মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ-র মোট পার্থক্য থেকে হিসেব করে বলতে পারব আমাদের একই নারী-পূর্বসূরি কত প্রজন্ম আগে ছিলেন। আপনি আমি যদি খালাতো ভাই বা বোন হই তা হলে মাত্র দুই প্রজন্ম আগে-আমাদের একই নানীই সেই পূর্বসূরি। সে ক্ষেত্রে আমাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ প্রায় একই থাকবে। সম্পর্ক মতো কাছের না হলে আপনার আমার একই নারী পূর্বসূরি সেই মানুষটি হবে আরও অতীতে– ডিএনএ পার্থক্যও তখন বেশি হবে।

১৯৮০-র দশকে কানিফোর্নিয়ায় বার্কলী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি বিখ্যাত গবেষণা চালিয়েছিলেন। সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে এরকম ১৩৫ জন মহিলা থেকে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়েছিল এতে। কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্য নিয়ে এই ডিএনএ-র সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে একটি পরম্পরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে– কারা কারা মাইটোকন্ড্রিয়ার জেনেটিক দিক থেকে পরস্পরের বেশি কাছাকাছি, কারা কারা অপেক্ষাকৃত দূরের। সেই সঙ্গে দেখা হয়েছে অন্যান্য জেনেটিক বিচারে সেটি যুক্তিসঙ্গত কিনা তাও, যাতে করে দৈবাত কারণে অযৌক্তিকভাবে কাছাকাছি হওয়ার ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ করা যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে যদি বিভিন্ন জায়গার ওদের কয়েক জনের ঐ ডিএনএ অনেকটা একই রকম দেখা যায় তা হলে বলা যায় যে, তাদের একই নারী-পূর্বসূরি থেকে অল্প কয়েক প্রজন্মে তাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর মধ্যেই সম্প্রতি তারা ঐ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে। আর যদি কাছাকাছি অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে, কাছাকাছি

বাস করেও তাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ-র তফাৎ অনেক, তা হলে বুঝতে হবে তাদের নারী পূর্বসূরি বহু বহু প্রজন্ম আগের- একই জায়গায় থেকেও তারা বহু প্রাচীন নানা ধারার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঠিক এই ব্যাপারটিই বার্কলীর পরীক্ষায় দেখা গেছে। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে এই মিল পাওয়া গেছে অনেক বেশি– তাদের পরস্পর অনেক বেশি ভৌগলিক দূরত্ব সত্ত্বেও। অন্য দিকে পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার মোটামুটি একই অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে অনেক বেশি ডিএনএ বৈচিত্র্য। ইঙ্গিতটি খুব স্পষ্ট। আদিতে সবাই আফ্রিকাতেই ছিল। তাদের পরবর্তীদের অনেকে এখনো আফ্রিকাতেই আছে এবং বহু হাজার বছরে তাদের মাইটোকোনড্রিয়াল ডিএনএ-তে অনেক পরিবর্তন জমা হয়েছে যা পরস্পরের সঙ্গে আলাদা। আর অপেক্ষাকৃত অনেক পরে তাদেরই অল্প কিছু মানুষ এশিয়া-ইউরোপে গিয়েছিল- এখানকার সবাই ঐ অল্প কয়েকজনের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বংশধর বলে তাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ মতো কাছাকাছি। হিসেব করে বলেও দেওয়া গেল কত প্রজন্ম আগে বা কত বছর আগে ঐ কয়েকজন এশিয়া-ইউরোপে এসেছিল। আর এদের সহ আফ্রিকার সবার মহিলা পূর্বসূরিও কত প্রজন্ম আগে একই ব্যক্তি ছিলেন। দেখা গেল মহিলা ছিলেন প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর আগের মানুষ। আর আফ্রিকা ছেড়ে মানুষ প্রথম এসেছিল প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে। এদিক থেকে তিনি আজকের সকল মানুষের সরাসরি নারী-পূর্বসূরি যাকে মাইটোকোন্ড্রিয়াল আদিমাতা বলা হয়।

তার মানে কি এই যে তিনিই প্রথম সেপিয়েন্স নারী– তাঁর আগে স্ত্রী সেপিয়েন্স কেউ ছিল না? মোটেই তা নয়। সেপিয়েন্স অবশ্যই তাঁরো কিছু আগে ছিল। কিন্তু তাদের কারও সাক্ষাত নারী বংশধর আজকের পৃথিবীতে বেঁচে নাই। তাদের মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ বহনকারী বংশধারাগুলো মাঝখানে কোথাও থেমে গেছে– কোনো নারী উত্তরসূরি না রেখেই। এটি হতেই পারে, যেমন হয় আজও কোনো নারীর কন্যা সন্তান না থাকলে। ভবিষ্যতে আবার আমরা একই পরীক্ষা করলে তখন কাছাকাছি সময়ে অন্য কোনো মহিলা মাইটোকোন্ড্রিয়াল আদি মাতা বিবেচিত হতে পারেন। কারণ ইতোমধ্যে আরও কিছু সরাসরি বংশধারা থেমে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও ঐ বার্কলী পরীক্ষা থেকে আমরা হোমো সেপিয়েন্স উদ্ভবের স্থান ও কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটি নিখুঁত ছবি পেয়ে যাচ্ছি।

ডিএনএ অনুসরণে আরও নানা তথ্য

মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ দিয়ে স্ত্রী-ধারা থেকে যেমন আজকের সব মানুষের মহিলা পূর্বসূরির স্থান ও কাল বের করা সম্ভব, তেমনি আর একটি পদ্ধতিতে পুরুষ

ধারার মাধ্যমে তা করা যায়। প্রয়োজন এমন কিছু ডিএনএ যা শুধু পুরুষ থেকে সন্তানে যায়, স্ত্রী থেকে যায় না। তা হলে এ ক্ষেত্রেও কোনো মিশ্রণ সম্ভব হয় না– অবিমিশ্র থেকে হুবহু এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যায়। এমনি ডিএনএ হলো দেহকোষের নিউক্লিয়াসে অন্যান্য ক্রোমোজোমগুলোর সঙ্গে থাকা Y ক্রোমোজোম, যা শুধু পুরুষের মধ্যে থাকে এবং পুরুষ সন্তানের মধ্যে যায়। আসলে এই Y ক্রোমোজোমই নির্ধারণ করে সন্তান ছেলে হবে কিনা। পুরুষের শুক্রকোষ থেকে Y ক্রোমোজোম গেলে ছেলে হয়, আর X ক্রোমোজোম গেলে মেয়ে হয়। মাইটাকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ-র মতো এক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন বহু প্রজন্মের মধ্যে যাবার সময় কিছু কিছু পরিবর্তন ইতস্তত এতে ঘটতে থাকে। আর আজকের নানা পুরুষ মানুষের মধ্যে এর বৈচিত্র্যের হার থেকে একইভাবে কত প্রজন্ম আগে কোথায় তাদের একই সাক্ষাত পূর্বসূরি ছিল তা বের করা যায়।

দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা গোষ্ঠীর পুরুষদের Y ক্রোমোজোমের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই আদি পুরুষ-পূর্বসূরিও দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর আগে আফ্রিকাতেই ছিল।

মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ এবং Y ক্রোমোজোম ডিএনএ মা ও বাবার থেকে পাওয়া ডিএনএর মিশ্রণে পরিবর্তিত হতে পারেনা বলেই অতীত অনুসন্ধানে এদের বিশেষ গুরুত্ব। অন্যান্য ক্রোমোজোমের ডিএনএ মায়ের ও বাবার থেকে প্রতি প্রজন্মে ইতস্তত মিশ্রিত অবস্থায় আসে বলে তা এই কাজে লাগে না। কিন্তু এই ক্রোমোজোমগুলোতেও কিছু কিছু সীমিত অংশ আছে যা ঐ স্ত্রী-পুরুষ মিশ্রণে অংশ গ্রহণ করে না, সেগুলোকেও অতীত অনুসন্ধানের জন্য অবিমিশ্র ডিএনএ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এদের বলা হয় হেপলোটাইপ ডিএনএ।

অতি সম্প্রতি আজকের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর থেকে সংগৃহীত মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ, Y ক্রোমোজোম ডিএনএ এবং বিভিন্ন হেপলোটাইপ ডিএনএ নিয়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণা চালানো হয়েছে। ২০০৭ সালে এর থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের পূর্বসূরিরা অন্তত দুইবার আফ্রিকা ছেড়ে এশিয়া ও ইউরোপে গিয়েছে- একবার ৫ লাখ বছর আগের কাছাকাছি সময়ে, আর একবার এক লাখ বছরের কাছাকাছি সময়ে। ফসিল গবেষণার ফলে আমরা ইতোমধ্যে যা জেনেছি, তার থেকে এই ফলাফল খুব ভিন্ন নয়। স্পষ্টত প্রথম অভিবাসনটি প্রায়-জ্ঞানীদের আর দ্বিতীয়টি আমাদের নিজেদের প্রজাতির। এ গবেষণা অবশ্য এর আগে ও পরে আরও অভিবাসনের সম্ভাবনা নাকচ করে দিচ্ছে না।

সমসাময়িক অন্য 'মানুষদের' সঙ্গে সেপিয়েন্সদের সম্পর্ক

সর্বশেষ ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত হোমো সেপিয়েন্সরা দীর্ঘকাল অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সহ অবস্থান করেছে- ইউরোপে নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে, এশিয়ায় ইরেকটাসদের সঙ্গে এবং আফ্রিকায় অন্যান্য প্রায়-জ্ঞানীদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কোনো পর্যায়ের ছিল এটিই আজকের দিনে গবেষকদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বিতর্ক। এখনো এই বিতর্কের পুরাপুরি অবসান হয়নি যদিও ডিএনএ গবেষণা এ সম্পর্কে বেশ খানিকটা ঐকমত্য এখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত ছিল বেশ কিছুদিন থেকে। প্রথমটি হলো বহু অঞ্চল তত্ত্ব (মালটিরিজিওনাল থিওরি)। দ্বিতীয়টি হলো সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন তত্ত্ব (কমপ্লিট রিপ্লেসমেন্ট থিওরি)। এবং তৃতীয়টি হলো প্রজননগত মিশ্রণ তত্ত্ব (ইন্টারব্রিডিং থিওরি)।

বহু অঞ্চল তত্ত্ব অনুযায়ী এক একটি অঞ্চলের পূর্ববর্তী মানব প্রজাতিগুলো থেকে পরবর্তী মানব প্রজাতিগুলো সরাসরি স্বাধীনভাবে ঐ অঞ্চলেই বিবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেকবার তাদেরকে আফ্রিকা থেকে নতুনভাবে আসতে হয়নি। এটি অনুযায়ী নিয়ানডার্থালরা ইউরোপে সেপিয়েন্সে এবং ইরেকটাসরা এশিয়াতে সেপিয়েন্সে বিবর্তিত হয়েছে। পরে সব অঞ্চলের সেপিয়েন্সদের মধ্যে প্রজননগত জিন-বিনিময়ের ফলে আজ সব জায়গায় সব সেপিয়েন্স একই প্রজাতিতে পরিণত। সাম্প্রতিক ডিএনএ গবেষণার ফলাফল এই তত্ত্বকে খুব একটা সমর্থন করছে না, তাই এটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। এই তত্ত্ব সঠিক হবার জন্য সারা দুনিয়ার মতো বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সেই অতীতকালেও যে ব্যাপকহারে যৌন-মিশ্রণ প্রয়োজন তাও বাস্তব সম্মত মনে হচ্ছে না।

এখনকার অধিক সমর্থিত তত্ত্ব হলো সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন তত্ত্ব। এটি অনুযায়ী আফ্রিকা থেকে নতুনভাবে ৮০ হাজার বছর আগে আসা আধুনিক মানব প্রজাতি ইউরোপে নিয়াডার্থালদের স্থান দখল করেছে। নিয়ানডার্থালরা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এশিয়াতে একই প্রক্রিয়ায় ইরেকটাসদের একই দশা ঘটেছে। তাই আজকের পৃথিবীর সব মানুষ আফ্রিকার সেই আধুনিক মানব প্রজাতির সরাসরি বংশধর।

প্রজননগত মিশ্রণ তত্ত্ব অনুযায়ী কাছাকাছি সহ-অবস্থানের সময়টিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজাতির মানুষের মধ্যে যৌন মেলামেশা ঘটেছে। ফলে বর্তমান মানুষের জেনেটিক গঠনে নিয়ানডার্থাল ও ইরেকটাস জিনের অন্তত কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। গবেষকরা কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই তত্ত্বকে তেমন আমল না দিলেও অতি সাম্প্রতিক ডিএনএ গবেষণায় একে পুরাপুরি বাতিল করা যাচ্ছে না।

২০০৭ সালে প্রকাশিত হেপলোটাইপ ডিএনএ গবেষণায় আজকের সব মানুষের আদি পূর্বসূরিদের একটি কাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৮ লক্ষ বছর আগে (হোমো ইরেকটাসের শুরুর কাল)। এর পর প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে এসে ঐ পূর্বসূরির ধারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়- একটি আমাদেরকে একধরনের 'গভীর প্রাচীনত্ব' দেয়, অন্যটি 'অগভীর প্রাচীনত্ব' দেয়-অর্থাৎ একটির বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকতর প্রাচীন, অন্যটির বৈশিষ্ট্যগুলো কম প্রাচীন। বহু-অঞ্চল তত্ত্ব দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো অঞ্চলের সেপিয়েন্স মানুষের পূর্বসূরিরা গভীর প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ধারণ করছিল– যেমন ইরেকটাসদের। আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ ধারণ করছিল অগভীর প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়ানডার্থালদের। বহু-অঞ্চল তত্ত্ব অনুযায়ী এই দুই অঞ্চলে আজকের মানুষ যদি পৃথকভাবে বিবর্তিত হয়ে থাকে, তা হলে এমনটিই হবার কথা। এখনকার মানুষদের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের সেপিয়েন্সদের যৌন মিশ্রণের ফলে এই দুইটাই এসে গিয়েছে।

কিন্তু এর চেয়ে আরও ভালো ব্যাখ্যা হতে পারে আগের প্রজাতির ও পরের প্রজাতির মানুষের মধ্যে প্রজননগত মিশ্রণ তত্ত্বের মাধ্যমে। ব্যাখ্যাটি এরকম অঞ্চল নির্বিশেষে আজকের সব মানুষ শুধু গভীর প্রাচীনত্বটাই তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের থেকে বহন করার কথা। পরবর্তীকালে নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে সহঅবস্থানের সময় তাদের সঙ্গে প্রজননগত মেলামেশার ফলে অগভীর প্রচীনত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের আজকের জেনেটিক গঠনে এসে মিশেছে। আরও কিছু হেপলোটাইপ ডিএনএ গবেষণা এই প্রজননগত মিশ্রণ তত্ত্বকে সমর্থন দিচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে এমন কিছু জিন বৈশিষ্ট্য এখন আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যার বৈচিত্র্য নির্দেশ করে যে সুদূর প্রাচীনকালে গিয়ে আমাদের পূবসূরিদের মধ্যে এগুলো ছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীনকালে ৫ লক্ষ বছর আগের দিকে আমাদের ধারায় এটি ছিল না। যেহেতু ঐ সময়েই নিয়ানডার্থাল ধারা আমাদের ধারা থেকে আলাদা হয়েছিল বলে ফসিল প্রমাণ রয়েছে, তাতে মনে হয় ঐ জিন বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ানডার্থাল ধারার সঙ্গে গিয়ে আমাদের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে থেকে এটি আবার আমাদের ধারায় ফিরে এসেছে। এখনকার মানুষের প্রাসঙ্গিক হেপলোটাইপ ডিএনএ বৈচিত্র্যের পরিমাণই তাই নির্দেশ করছে। এর সহজ ব্যাখ্যা একটাই– তা হলো নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে যৌন মিশ্রণেই ওগুলো এসময় আমাদের জেনেটিক গঠনে আবার ফিরে এসেছে। কাজেই সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন তত্ত্বকে একেবারে নিশ্ছিদ্র ভাবে মেনে নেবার সুযোগ আর থাকছে না অতি সাম্প্রতিক এই গবেষণাগুলো ফলে। মনে করা হচ্ছে যে,

এর সঙ্গে প্রজননগত মিশ্রণের অবদানও অন্তত কিছুটা হলেও ছিল। উভয়ের প্রজাতি এক হিসাবে আলাদা হলেও পার্থক্য মতো বেশি ছিল না যে যৌন সংশ্রব সৃষ্ট পরবর্তী বংশধারা এগুতে পারবে না।

নিয়ানডার্থাল হাড় থেকে ডিএনএ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপেক্ষাকৃত পুরনো হাড় থেকে কোষ সংগ্রহ করে তার ডিএনএ গঠন উদ্ঘাটন করার প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে বহুদিন আগের মৃতদেহ থেকে তো বটেই হাজার হাজার বছরের পুরনো হাড় থেকেও তা করা সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত সব চেয়ে পুরনো যে প্রাণীর ডিএনএ এভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে তা হলো স্পেনে আবিস্কৃত ৪ লক্ষ বছর পুরনো একটি গুহাবাসী ভালুকের হাড়ের। খুবই স্বল্প দৈর্ঘ্য ডিএনএ-র কিছু টুকরা অংশের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছে। এর কারণ হলো দেহাবশেষ যত পুরনো হবে অবিকৃত কোষ ও ডিএনএ তাতে পাওয়ার সম্ভাবনা ততই কমে যায়। তাছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিলাস্তরের সঙ্গে সরে গিয়ে তাতে ডিএনএ বিশুদ্ধ থাকার সম্ভাবনাও কমে যায়। এ সব সত্ত্বেও মতো প্রাচীন প্রাণিদেহের ডিএনএ গঠন যে আদৌ উদ্ঘাটন করা যাচ্ছে এটিই অবাক হবার বিষয়। এ যেন দীর্ঘকাল ধরে বিলুপ্ত প্রাণীর দেহের ব্লু-প্রিন্ট পুনরাবিষ্কার করা।

১৯৯৭ সালে প্রথম নিয়ানডার্থাল হাড় থেকে মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ গঠন উদ্ঘাটনের সাফল্য আসে। এর পর পরই ক্রোয়েশিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ানডার্থাল হাড় থেকে নিউক্লিয়াসের সাধারণ ক্রোমোজোম ডিএনএ-র ক্ষেত্রেও এটি সফলভাবে করা গেছে। এর মাধ্যমে ৩৮ হাজার বছর পুরনো নিয়ানডার্থাল দেহের কিছু অসুখ-বিসুখ, গায়ের রং, চুলের রং ইত্যাদি তথ্য সংবলিত ডিএনএ কোড জানা গেছে। আরও সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সে ছয় জন পৃথক নিয়ানডার্থাল মানুষের হাড় ডিএনএ পরীক্ষার জন্য খুব উপযুক্তভাবে পাওয়া গেছে। স্বজাতি দেহ খাওয়ার অভ্যাসের কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক এই হাড়গুলো গোড়া থেকেই সংলগ্ন মাংস ও ভেতরের মজ্জা থেকে মুক্ত ছিল। এই জিনিসগুলোই সাধারণত হাড়ের কোষে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ও অবক্ষয়ের কারণ ঘটিয়ে থাকে। তাই এ সব হাড়ের ডিএনএ বেশ সফল ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে ঐ ৩০-৩৫ হাজার বছর আগের নিয়ানডার্থালদের সমসাময়িক আমাদের মতো মানুষের হাড়ের ডিএনএ ও পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। ফলে উভয়ের তুলনামূলক জেনেটিক প্রকৃতি এখন আমাদের কাছে রয়েছে।

মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিয়ানডার্থালদের এই ডিএনএ সমসাময়িক সেপিয়েন্সদের ডিএনএ-র থেকে অন্তত ২৪টি জায়গায় একেবারেই ভিন্ন। এতগুলো ভিন্নতার কারণে নিয়ানডার্থালকে বর্তমান মানুষের আফ্রিকান আদিমাতার বংশোদ্ভূত বলে মনে করার কোনো সুযোগ থাকেনি। বরং এই ভিন্নতাগুলো থেকে হিসেব করে বলা যায় যে, ঐ নিয়েনডার্থাল ও ঐ সেপিয়েন্সের পূর্বসূরিরা ঐ আদিমাতার কালের বহু আগে, এখন থেকে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

ক্রোমোজোম ডিএনএ-র ক্ষেত্রেও নিয়ানডার্থাল ডিএনএ-র সঙ্গে সমসাময়িক সেপিয়েন্স ডিএনএ-র বেশ কিছু স্পষ্ট পার্থক্য পাওয়া গিয়েছে। এটুকু স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, ৩৫ হাজার বছর পুরনো সেপিয়েন্স ডিএনএ এবং আজকের মানুষের ডিএনএ-র যে পার্থক্য, তার সমসাময়িক নিয়ানডার্থাল ডিএনএ-র সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক বেশি। অন্তত এসব তুলনামূলক ডিএনএ বিচারে এখনকার সেপিয়েন্স ও নিয়ানডার্থালদের মধ্যে প্রজননগত সম্পর্কের কোনো পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবে এরকম সম্পর্কের প্রমাণ আরও একটি দিক থেকে আসতে পারে। তা হলো নিয়ানডার্থাল ও সেপিয়েন্স উভয়ের মিশ্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসিলের আবিষ্কার। হয়তো মধ্যবর্তী সময়ে এরকম মিশ্র বৈশিষ্ট্যের মানুষ পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। অতি সম্প্রতি মুখাবয়বে এরকম কিছু মিশ্র অবয়বধারী একটি অল্প বয়সী ছেলের ফসিলের আবিষ্কার গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তবে তার থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার মতো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সে যাই হোক, অতি সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো, বিশেষ করে হেপলোটাইপ ডিএনএ গবেষণা, সেপিয়েন্স কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন তত্ত্বে কিছুটা সন্দেহের ফাটল সৃষ্টি করতে পেরেছে বৈকি। এখন অনেকেই মনে করছেন এর সঙ্গে প্রজননগত মিশ্রণের ভূমিকার বিষয় এখনো পরিত্যাগ করার সময় আসেনি।

ডিএনএ থেকে অভিবাসন কাহিনী

ফসিল ও ডিএনএ গবেষণা থেকে মোটামুটি নিশ্চিত বুঝা যাচেছ যে, ৮০ হাজার বছর আগে নাগাদ হোমো সেপিয়েন্সরা আফ্রিকা থেকে বাকি পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেছিল। আর আফ্রিকা থেকে সে সময় তাদের বের হয়ে আসার পথ ছিল লোহিত সাগরের সমান্তরালে সাহারা অতিক্রম করে উত্তরে সিনাই দিয়ে বর্তমান ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন-জর্দান হয়ে মধ্য এশিয়ায়, দূরপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে।

অতি সাম্প্রতিক ডিএনএ গবেষণায় ৮০ হাজার বছর আগে শুরু হওয়া নানা মহাদেশে মানুষের এই বিস্তৃত হবার কাহিনী আরও স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে জানতে পারার একটি কারণ হচ্ছে সেই প্রাচীনকালে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যারা গিয়েছে তারা অনেক সংখ্যায় দলে দলে যায়নি– তা সম্ভব ছিল না। অল্প কিছু মানুষই প্রথমে এভাবে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বহন করে নিয়েছে নিজেদের কিছু বিশেষ জেনেটিক মার্কার সাধারণ ইতস্তত মিউটেশন বা পরিবর্তনের ফলে যা সব সময় কিছু কিছু সৃষ্টি হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায়

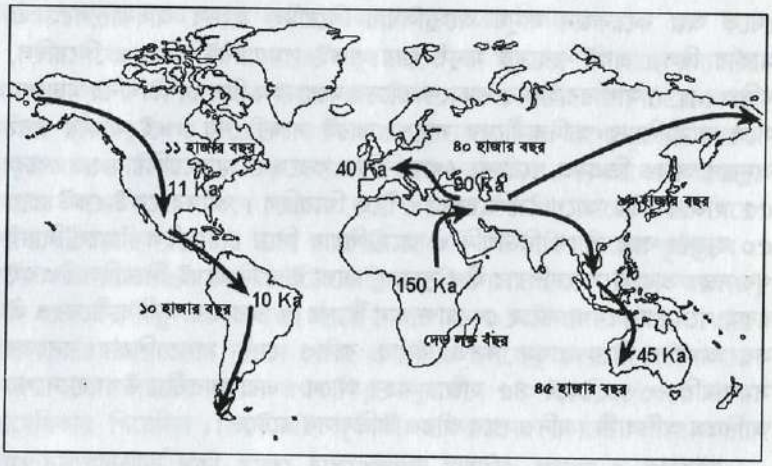

আফ্রিকা থেকে, জ্ঞানী মানুষ

সঞ্চারিত হচ্ছে। মার্কারগুলো যদি মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ, কিংবা Y ক্রোমোজোমে অথবা হেপলোটাইপ ডিএনএ-তে থাকে তা হলে মিশ্রণের অনুপস্থিতিতে তা প্রায় অবিকল বহু প্রজন্মে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। যে অল্প কয়েকজন নতুন জায়গায় প্রথম গিয়েছে তাদের মধ্যে কোনো একটি মার্কারবাহী মানুষ থাকতে পারে। ফলে নতুন জায়গায় পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ঐ মার্কারের ব্যাপকতা দেখা যাবে। তাদের আজকের বংশধরদের মধ্যেও এর ব্যাপকতা দেখা যাবে। পৃথিবীর অন্য যে জায়গায় ঠিক ঐ মার্কারের অনুরূপ ব্যাপকতা দেখা যাবে ধরে নেওয়া যাবে ঐ দলটির পরপর প্রজন্মগুলো শীঘ্রই ওখানেও গিয়েছিল, কখন গিয়েছিল তা জানা যাবে ঐ মার্কারের ব্যাপকতার পরিমাণ থেকে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ডিএনএ গবেষণার মাধ্যমে আমরা পুরো পৃথিবীতে সেপিয়েন্স অভিবাসনের একটি ম্যাপিং সাম্প্রতিককালে খাড়া করতে পেরেছি।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, M130 নামে পরিচিত জেনেটিক মার্কারটি পুরুষদের Y ক্রোমোজোমের একটি বিরল ডিএনএ সমাহার। আজকাল মালয়েশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এটি দেখা যায় শতকরা ১০ ভাগ ক্ষেত্রে। নিউগিনিতে দেখা যায় ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে। এর থেকে বুঝা যায়, M130 মার্কার ধারী কিছু মানুষ মালয়েশিয়া, নিউগিনি হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল।

অস্ট্রেলিয়ায় মতো বেশি দেখা যাবার কারণ হলো খুব সম্ভব মালয়েশিয়া থেকে অল্প কয়েকজন মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল যাদের অধিকাংশেরই ঐ মার্কার ছিল। একই ধরনের মানুষ প্রায় একই সময় নিউগিনিতেও গিয়েছিল, যদিও M130 মার্কারবাহীদের শতাংশ তাদের মধ্যে কম ছিল। নিউগিনির মানুষের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাদৃশ্য তারই সাক্ষ্য দেয়। এই মার্কার এবং অনুরূপ আরও ডিএনএ গবেষণা এখন নিশ্চিত করছে যে মালয়েশিয়ায় ৬০ থেকে ৫৫ হাজার বছর আগে সেপিয়েন্সরা পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের কেউ-কেউ প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিল। অস্ট্রেলিয়ায় খুব সম্ভব তারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি হয়েই গিয়েছিল। একই রকম গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে আন্দামান দ্বীপের ও ভারতের আদিবাসীদেরও ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে প্রথম বসত করার কালও সেই মালয়েশিয়ার বসতের সমসাময়িক– ৬০ থেকে ৪৫ হাজার বছর আগে। এরা ভারতীয় উপমহাদেশের আদিতম অভিবাসী। যদিও পরে আরও অভিবাসন ঘটেছে।

ইউরোপ ও সংলগ্ন এশিয়ার অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অভিবাসনের যে তারিখ পাওয়া যাচ্ছে সেটি অনেক পরের ঘটনা। এখানকার আজকের নানা গোষ্ঠীর পুরুষের মধ্যে Y ক্রোমোজোমের কয়েকটি মার্কার নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা চালানো হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে মধ্য এশিয়াতে সেপিয়েন্স মানুষ বহু আগে থেকেই ছিল বটে কিন্তু মাত্র ৪০ হাজার বছর আগে এখান থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন দিকে অভিবাসী হয়েছে। একটি দল দক্ষিণে ভারতের দিকে গিয়েছে। আর একটি উত্তরে ককেশাস অঞ্চলে গিয়ে প্রধানত দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে। একটি ধারা পশ্চিমে উত্তর ইউরোপের দিকে গিয়েছে এবং অন্যটি পূর্বে রাশিয়ার দিকে। মধ্য এশিয়া থেকে প্রায় একই সময়ে আর একটি অভিবাসন ঘটেছে তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রিস হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনে।

একটি আরও সাম্প্রতিক তত্ত্ব ডিএনএ ও ফসিল সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। তা হলো প্রায় ৬৫ হাজার বছর আগে পূর্ব আফ্রিকা থেকে সরাসরি সোমালিয়া হয়ে ইয়েমেন, ওমান, ইরাণের দক্ষিণ উপকূল ধরে একটি উপকূলীয় অভিবাসন দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল। এই পুরো

মানবগোষ্ঠীর জীবিকা, অভ্যাস সব কিছু নির্ভর করেছে সমুদ্র উপকূলের ওপর। একে বলা হচ্ছে দক্ষিণাপথ (সাদার্ন রুট)। এ পথের একটু সুবিধা ছিল এতে মরুভূমি, পাহাড় পর্বত ও অন্যান্য প্রতিকূলতা ছিল কম। সমুদ্র তীর ধরে তাই মানুষ দ্রুততর ভাবে অগ্রসর হতে পেরেছে প্রধানত সমুদ্রের মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে, যা আগাগোড়া এই বিশাল পথে ও ভূখন্ডে প্রায় একই রকম ছিল। অভিবাসী মানুষকে তাই সেই পর্যায়ে খুব নতুন কোনো পারিবেশিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি দেশ থেকে দেশান্তরে। অবশ্য আমরা যাকে দ্রুততর বলছি তাও হাজার হাজার বছরের বিষয়।

সব গবেষণাতেই দেখা যাচ্ছে মানুষ আমেরিকা মহাদেশে গিয়েছে অন্য সব জায়গার পর। এশিয়া আর উত্তর আমেরিকার মধ্যে বেরিং প্রণালী যে সময় শুকিয়ে স্থলসেতু দেখা দিয়েছিল তখন মাত্র ১২ হাজার বছর আগে দূরপ্রাচ্য থেকে মানুষ আলাস্কা দিয়ে আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে এরা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে একেবারে চিলি, আর্জেন্টিনায় গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল। তারাই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ। তবে অতি সাম্প্রতিক কিছু মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডিএনএ গবেষণা থেকে আন্দাজ করা হচ্ছে এর কিছু আগেও উত্তর আমেরিকাতে মানব- অভিবাসন ঘটেছিল। প্রায় বিশ হাজার বছর আগে নাগাদ বেরিং প্রণালীতে স্থলসেতু দেখা দিয়েছিল মাত্র কয়েক হাজার বছরের জন্য। তখন কিছু মানুষ চীন ও সাইবেরিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় গিয়েছিল। তবে এই পূর্ববর্তী অভিবাসনের কোনো ফসিল-প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

মস্তিষ্ক, ভাষা, কালচার

জ্ঞানী মস্তিষ্ক

একটি বিষয় এখন খুব স্পষ্ট তা হলো প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় উদ্ভূত, সেখানে প্রাথমিকভাবে বিকশিত এবং প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় বিস্তৃত হোমো সেপিয়েন্স বেশ দ্রুত গতিতেই পৃথিবীজোড়া তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এর ফলে শীঘ্রই প্রত্যেকটি অঞ্চলে পূর্ববর্তী মানব প্রজাতিগুলোর জায়গা তারা দখল করতে পেরেছে। অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু জ্ঞানী আমরা– হোমো সেপিয়েন্স– একমাত্র মানব প্রজাতি হিসাবে টিকে থেকে নিজ বুদ্ধিবলে আজ নিজেদের এই মানব ইতিহাস উদ্ঘাটনও করতে পারছে। অবশ্যই এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ তাদের উন্নত মস্তিষ্ক।

আমরা দেখেছি নিয়ানডার্থালদের মস্তিষ্ক আমাদের চেয়ে বড় ছিল। কিন্তু উন্নত মস্তিষ্ক হওয়ার জন্য বড় মস্তিষ্কের চেয়েও বেশি প্রয়োজন এনসেফেলেশন রেশ্যো বড় হওয়া- অর্থাৎ মস্তিষ্কের আকার ও দেহের আকারের অনুপাতটি বড় হওয়া। এটি আমাদের বেশি নিয়ানডার্থালদের থেকে। তা ছাড়া মনে করা হয় যে মস্তিষ্কের জটিলতর গঠন যা উন্নততর চিন্তার সুযোগ করে দেয় তাও আমাদের প্রজাতিতে অনেক বেশি। এটি অবশ্য সরাসরি প্রমাণ করা যায় না, কারণ পরীক্ষার মাধ্যমে তুলনা করার জন্য কোনো নিয়ানডার্থাল মস্তিষ্ক আমাদের কাছে নাই। কিন্তু নিয়ানডার্থালদের হাতিয়ার, জীবনযাত্রা, চিন্তার প্রকৃতি ইত্যাদির নানা নিদর্শন থেকে যা বুঝা গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে তাদের চিন্তার জটিলতা ও

সক্ষমতা সেপিয়েন্সদের চেয়ে কম উন্নত ছিল, যার কারণ মস্তিষ্কের গড়নের কম অগ্রসরতার মধ্যেই নিহিত থাকার কথা।

তবে এ কথা বলা যায়, সেপিয়েন্স মস্তিষ্কের সম্পর্কে যতই গবেষণা হচ্ছে ততই এর অপূর্ব কারুকার্য আর ক্ষমতা আমাদেরকে চমৎকৃত করছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে তিন হাজার কোটি নার্ভ কোষ বা নিউরোন। তবে তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এ মস্তিষ্কের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ- স্রেরেব্রাল কোর্টেক্সটি অত্যন্ত উন্নত এবং নিজেই এক হাজার কোটি নিউরোন দিয়ে গঠিত। প্রতিটি নিউরোনের অসংখ্য সরু রশ্মির মতো শাখা সিনাপস নামক সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য বহু নিউরোনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। নিউরোনের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু জটিল ও উন্নত চিন্তার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই সিনাপস এর সংখ্যা। আমাদের মস্তিষ্কে এদের সংখ্যা দশ কোটি। নিউরোনের বৈচিত্র্যও সেপিয়েন্স মস্তিষ্কের একটি বড় দিক। অন্তত ৪০ বিভিন্ন রকমের নিউরোন এতে রয়েছে যা বিশ্লেষণমূলক চিন্তাকে সম্ভব করে তুলেছে। সভ্যতা আর জ্ঞানবিজ্ঞান এই মস্তিষ্কের ব্যবহারকে আজ তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু হোমো সেপিয়েন্স উদ্ভবের সময় থেকেই গত দেড় লক্ষ বছর এই মস্তিষ্কের ক্ষমতার বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি- নানা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটিই মনে করা হয়। তাই জটিলতর চিন্তার সুযোগ গোড়া থেকেই সেপিয়েন্সের ছিল-অতীতে তার ক্ষেত্র ভিন্নতর হলেও। হয়তো বা এই রকম চিন্তার জন্য সেপিয়েন্সের বর্তমান গড়নটিই সর্বোত্তম এবং সব চেয়ে যুগোপযোগী। এই চিন্তা যেই সভ্যতার সৃষ্টি করেছে টিকে থাকা ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার সংগ্রামে, তার পর থেকে সেটিই বরং প্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে। মস্তিষ্ক আরও বড় বা জটিল হওয়ার মধ্যে বাড়তি কোনো সুবিধা আসছে না। তাই এদিক থেকে আর কোনো বড় বিবর্তনও হচ্ছে না, হয়তো হবেও না।

উন্নত চেতনা, উন্নত চিন্তা

নিয়ানডার্থালদের এবং হয়তো ইরেকটাসদেরও মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ, দুই পাশ নেহাত কম উন্নত ছিল না। এই অংশগুলো দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ এবং সেগুলো থেকে সাড়া দেবার ক্ষমতায় পারদর্শিতা দিয়ে থাকে। অনেকটা সরাসরি অভিজ্ঞতার সরলতর চেতনার দিক থেকে এগুলো যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু সেপিয়েন্সদের মধ্যে মস্তিষ্কের সামনের অংশটি বিকশিত হয়েছিল অভাবনীয় ভাবে। দেখা গেছে যে এই অংশ জটিলতর চিন্তার ক্ষমতা রাখে। সাম্প্রতিক PET স্ক্যানিং এ দেখা গেছে যে, অন্যের মনের চিন্তার কথা ভাবার সময় বা সামাজিক নানা জটিল চিন্তার

সময় মস্তিষ্কের এই সামনের অংশটিই উদ্দীপ্ত হয়। সাধারণ দেখা, শোনা, কথা বুঝা ইত্যাদি চিন্তার সময় অন্য অংশগুলো সে রকম হয়। এই জটিল চিন্তা শুধু তাৎক্ষণিক বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে না, শুধু নিজের ঐ সময়ের অভিজ্ঞতাতে সাড়া দিয়েই চেতনার পরিচয় দেয় না। বরং এটি নিজের প্রত্যক্ষ দেখাশোনাকে আপাতত সরিয়ে রেখে অন্যের দৃষ্টিতে কোনো ব্যাপারকে ভাবতে পারে, অন্যের ভাবনাকে উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারে, যা চোখের সামনে নাই তা কল্পনা করতে পারে। এটিই জটিলতর চিন্তা, উন্নততর চেতনার সক্ষমতা।

আসলে অন্যের মনকে পড়ার ব্যাপারটা কী? আমি আমার ভাবনা ভাবছি; অন্যে কী ভাববে বা ভাবতে পারে তা আমি ভাবছি; তৃতীয় জনের ভাবনা দ্বিতীয়জন কি ভাবে নিচ্ছে, আর আমি উভয়টি সম্পর্কে কী ভাবছি;– একে এ ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে চিন্তার জটিলতার পর্যায়গুলোও বুঝা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের চিন্তা শুধু সরাসরি নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে, নিজের কাছে পাওয়া তথ্য নিয়ে। এটি হয়তো অনেক প্রাণীর রয়েছে– শিম্পাঞ্জির চমৎকারভাবে আছে। কিন্তু এর উচ্চতর পর্যায়গুলো শুধু মানুষেরই আছে। মানব-সদৃশদের মধ্যেও হয়তো এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের ছিল। আরও উচ্চ পর্যায় একমাত্র সেপিয়েন্সদের মধ্যেই আছে। এ রকম যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে চিন্তার একটি নাটকীয় উদাহরণ দেওয়া যাক। শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকে খলচরিত্র ইয়াগো ওথেলোর স্ত্রী ডেসডেমোনা সম্পর্কে অপবাদ দিয়ে ওথেলোর মনকে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখানে ইয়াগো যে একটা কিছু চেয়েছে বা ভেবেছে এটি তার প্রথম পর্যায়ের চিন্তা। কিন্তু সে তার নিজের অভিজ্ঞতার কিছু ভাবেনি, সে ভেবেছে ওথেলো তার কথা শুনে কী করবে সেই কথা- এটি তার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিন্তা। কিন্তু ব্যাপারটা তাতেও সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে ভেবেছে যে ওথেলো তার কথা শুনে ভাববে ডেসডেমোনার মনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম-ভাব জাগ্রত হয়েছে। কাজেই তার চিন্তাটি আসলে তৃতীয় পর্যায়ের চিন্তা। নাটকটি অভিনীত হবার সময় এর দর্শকরা কিন্তু ভাবছে ইয়াগোর ভাবনার কথা– যে ভাবনায় আছে ওথেলোর ভাবনায় ডেসডেমোনার ভাবনার কথা। কাজেই দর্শকের চিন্তাটি চতুর্থস্তরের। নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়ারকে কিন্তু দর্শকের ভাবনাও ভাবতে হয়েছে– আগের সব পর্যায়ের ভাবনাসহ। তাই শেক্সপীয়ারের ভাবনাটি পঞ্চম পর্যায়ের ভাবনা। আসলে পঞ্চম পর্যায়ের ভাবনার জন্য শেক্সপীয়ার হবার প্রয়োজন নাই। এটি হোমো সেপিয়েন্স মস্তিষ্কের সাধারণ সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, সেপিয়েন্সমাত্রই সে রকম ভাবার ক্ষমতা রাখে।

প্রশ্ন হলো এই ক্ষমতা বিবর্তনের ইতিহাসে কখন মানুষ প্রথম পেয়েছে? নিয়ানডার্থালদের কি এটি ছিল? মনে হয় মস্তিষ্কের আকারের সঙ্গে এর একটি

সম্পর্ক আছে, যেমন আছে মস্তিষ্কের জটিলতার সঙ্গে, বিশেষ করে সেরিব্রাল কোরটেক্সের জটিলতার সঙ্গে। সেই হিসাবে ধারণা করা হয়, শিম্পাঞ্জির মধ্যে যেমন শুধু প্রথম পর্যায়ের চিন্তার ক্ষমতা আছে। অস্ট্রোলোপিথেকাসরাও হয়তো প্রায় সমান মস্তিষ্ক নিয়ে সমান ক্ষমতাই রাখত। সাম্প্রতিক একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, শিম্পাঞ্জি খাবার লুকিয়ে রাখে এবং তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ সামনে থাকলে ঐ লুকানোর জায়গার দিকে যে মোটেই তাকায় না। কিন্তু সেই শক্তিশালী জন চলে গেলে অন্য দুর্বলদের সামনে সেই দিকে তাকাতে মোটেই ভয় পায় না। তাতে মনে হয় শিম্পাঞ্জি অন্যের মনে কি আছে, কি দেখা দিতে পারে তা ভাবতে পারে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের চিন্তা করতে পারে। অস্ট্রালোপিথেকাসরাও তাই এটি করতে পারার কথা। তৃতীয় পর্যায়ের চিন্তা খুব সম্ভব হোমো মানুষদের অধিকারেই ছিল-হোমো ইরেকটাসের বা হয়তো হোমো হাবিলিসেরও। তাদের জীবন ধারা, সামজিকতা সে রকম ইঙ্গিতই দেয়, তাদের বৃহত্তর মস্তিষ্কও। এর পরের উন্নয়ন নিয়ে নিশ্চিত করে বলা দুরূহ। প্রায়-জ্ঞানীরা, বিশেষ করে নিয়ানডার্থালরা সেপিয়েন্সদের মতো সকল জটিল চিন্তা না করতে পারলেও তারা অন্তত চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ের চিন্তায় সক্ষম ছিল বলেই মনে হয়। তবে এরকম চিন্তার ক্ষমতাকে সেপিয়েন্সরা যে জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে, বিশেষ করে তাদের সভ্যতার উন্মেষের পর থেকে, তার কোনো তুলনা নাই।

ভাষার প্রকৃতি

সেপিয়েন্সদের পক্ষে সভ্যতার পথে এগুনো সম্ভব হয়েছে তারা ভাষার অধিকারী হতে পেরেছে বলে। মনে করা হয় সত্যিকারের ভাষা শুধু তারাই অর্জন করেছে তাদের উন্নত মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ব্যবস্থার ফলে। আসলে উন্নত মস্তিষ্ক, জটিলতর চিন্তা, চেতনা, কল্পনা শক্তি এবং ভাষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে। যে অর্থে এখানে আমরা ভাষার কথা বলছি সেটি শুধু তথ্য দেওয়া বা নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তথ্য দেওয়া-নেওয়ার অর্থে ভাষা অনেক প্রাণীর রয়েছে। কুকুরকে বা অন্যান্য কিছু প্রাণীকে বিভিন্ন নির্দেশমত সুনির্দিষ্ট কাজ করতে প্রশিক্ষিত করা যায়। শিম্পাঞ্জিকে আরও ভালোভাবে তথ্য বিনিময়ের ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেমন বিভিন্ন রং বা আকৃতির জিনিস বেছে নিতে, এক তথ্যের সঙ্গে আর এক তথ্য মিলাতে।

আবার কাউকে কোনো দক্ষতা শিখিয়ে দেবার জন্য যে মাধ্যম বা প্রক্রিয়া তার মধ্যেও ভাষা সীমাবদ্ধ নয়। বাঘিনী তার বাচ্চাকে খুবই বিস্তারিতভাবে শিকার

ধরার কৌশল শিখিয়ে থাকে- এজন্য নানা প্রদর্শন, নানা ধমক সবই ব্যবহার করে- কিন্তু ভাষার ব্যবহার না করেই। আমরা যে অর্থে ভাষার কথা বলছি তা কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ের চিন্তা ও জটিল সামাজিক চেতনাকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। একটি উপমা দিয়ে বুঝার চেষ্টা করা যাক।

বেশ কিছু বছর আগে পতঙ্গবিদ্যায় একটি চমৎকার আবিষ্কার হয়েছিল- মৌমাছিরা পরস্পরকে কিভাবে মৌ-ভর্তি ফুলের সন্ধান দিয়ে থাকে তার ওপর। এর ফলে আমরা জানি মৌমাছি এই তথ্য জানাতে গিয়ে নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। তারা উড়ন্ত অবস্থায় নাচতে নাচতে বাংলা ৪ সংখ্যাটির মতো আকৃতি রচনা করে। ৪ এর মধ্যবিন্দু থেকে তখনকার সূর্যের অবস্থান পর্যন্ত রেখা এবং ফুলের দিক পর্যন্ত রেখা যে কোণ উৎপন্ন করে সেটিই- ফুলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য মৌচাকের অন্যান্য মৌমাছিদের জানিয়ে দেয়। ওরা সেই কোণটি মনে রেখে, সূর্যের সঙ্গে সেই রকম কোণ করেই অনেক দূরের ফুলের দিকে উড়ে যায়। কতদূর যেতে হবে তারও একটি ধারণা সংবাদদাতা মৌমাছি দিয়ে দেয়। মিনিটে কতবার হারে সে ৪ আকৃতিটি রচনা করছে তা যত দ্রুত হবে ফুলের দূরত্বও তত বেশি হবে।

কেউ হয়তো বলবেন এখানেই তো চমৎকার ভাষা রয়েছে মৌমাছির, হোক না সেটি আকারে ইঙ্গিতে। কিন্তু ঐ ভাষায় কি মৌমাছি কখনো জানতে পারবে ঐ মধুর স্বাদ কি গতকালে সংগৃহীত মধুর চেয়ে ভালো? অথবা সেই ফাঁকে সে কি গলা নামিয়ে বলতে পারবে তাদের কলোনির কয়েকটি পুরুষ মৌমাছির প্রতি রাণীমা ইদানীং খুবই অসহিষ্ণু আচরণ করছেন। তাছাড়া আগামী মৌসুমে এই চাকটি ছেড়ে নতুন চাকে চলে যাওয়া উচিত এমন মতামতও সে কখনো দিতে পারবে না। কিন্তু সত্যিকার ভাষা, মানুষের ভাষা হতে হলে তার মধ্যে এই সব সুযোগ থাকতে হবে– জটিল সামাজিক সম্পর্ক ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশের সুযোগ, শুধু কারিগরি তথ্য দেবার বা পাওয়ার সুযোগ নয়। এতে অতীত-ভবিষ্যতের কথা, সম্ভাবনার কথা, কল্পনার কথা, অনুরাগ-বিরাগের কথা বলার সুযোগ থাকতে হবে। এক কথায় তাতে এক রকম 'সাহিত্য' সৃষ্টির সুযোগ থাকতে হবে– হোক না সেটি লিখিত সাহিত্য নয় বা আনুষ্ঠানিক সাহিত্য নয়, নেহাতই মানুষের দৈনন্দিন সুখে-দুঃখে বা কাজে ব্যবহৃত আটপৌরে সাহিত্য। এটিই মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্য, আর এই ভাষা এই অর্থে 'সাহিত্য' সৃষ্টির সুযোগ ও অভ্যাস সেপিয়েন্সদের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ছিল এবং এটিই তাদেরকে মতো দ্রুত সভ্যতার পথে নিয়ে যেতে পেরেছে।

ভাষার শারীরবৃত্ত

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে মস্তিষ্কেই ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু তার প্রকাশের জন্য আরও শারীরবৃত্তের প্রয়োজন। এর সবই মানুষের দীর্ঘ বিবর্তনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। আগেই দেখেছি অস্ট্রালোপিথেকাসদের ফসিল থেকে বুঝা যাচ্ছে তাদের পক্ষে ভাষা সম্ভব ছিল না- মস্তিষ্কের দিক থেকেও না, স্বর সৃষ্টির জন্য কণ্ঠ বা বক্ষের দিক থেকেও না। তবে হোমো ইরেকটাসের মধ্যে বাক শক্তি নির্ভর ভাষার সম্ভাবনা না থাকলেও ভাষার প্রস্তুতির কিছু লক্ষণ আমরা দেখেছি। মস্তিষ্কের যে অংশ একই সঙ্গে বাকনির্ভর ভাষা এবং হাতের সূক্ষ্মতর নড়াচড়ার মোটর মেকানিজম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সেই অংশের বিকাশ দেখেছি। তাই তাদের ভাষা না থাকলেও সামাজিক যোগাযোগের জন্য স্বর ও ইশারাভিত্তিক উন্নত ব্যবস্থা ছিল– যাকে ভাষার এক রকম প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। সত্যিকার ভাষার প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্ত প্রায়-জ্ঞানীদের মধ্যে, বিশেষ করে নিয়ানডার্থালদের মধ্যেই প্রথম দেখা গেছে। অনেকে মনে করেন নিয়ানডার্থালদের এই ভাষা ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ গবেষকের মতো তাদের ভাষা এক রকম প্রাক-ভাষার (প্রোটো-লাঙ্গুয়েজ) এর পর্যায়ে থেকে গেছে। ভাষার সত্যিকার স্ফুরণ হয়েছে সেপিয়েন্সদের মধ্যে এবং তাদের সাফল্যের এটি ছিল একটি চাবিকাঠি।

বাকনির্ভর ভাষার শারীরবৃত্তের কিছু নির্দেশক ফসিলের মধ্যেই চিহ্নিত করা সম্ভব। মাথার খুলির পেছনের একটি ছিদ্র থাকে যার ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে জিহ্বায় সিগন্যাল পাঠাবার স্নায়ুগুলো যায়। কথা বলার জন্য মুখগহ্বরের সূক্ষ্ম নড়াচড়াগুলো এই স্নায়ুর ওপর নির্ভর করে। মানুষের খুলিতে এই ছিদ্র এইপের চেয়ে অনেক বড় কারণ কথা বলার জন্য এই স্নায়ুরজ্জুকে মোটা হতে হয়, তাই খুলি থেকে যাওয়ার জন্য ঐ ছিদ্রকেও বড় হতে হয়। প্রায়-জ্ঞানীদের আগে পর্যন্ত সব মানব-সদৃশদের ক্ষেত্রেও এই ছিদ্র যথেষ্ট ছোট, বাকশক্তির উপযোগী নয়। অবশ্য ইরেকটাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তাছাড়া মানুষের মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলোর মধ্য দিয়ে যে স্নায়ুপথ তা দেখে মনে হয় যে বাকশক্তির উপযুক্ত করে বুকের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ তার ছিলনা– তার আগেও কারোই ছিল না। এটিও প্রায়-জ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম দেখা যায়।

আর একটি বড় জিনিস হলো গলার মধ্যে স্বরতন্ত্রী ব্যবস্থাটির (ল্যারিংস) অবস্থানে। আমাদের ক্ষেত্রে এটি গলার বেশ নিচের দিকে- কথা বলার সময় গলার যে ছোট দলাটি উঠানামা করে তার ঠিক নিচে। কিন্তু এইপের ক্ষেত্রে এটি অনেক উপরে জিহ্বার ঠিক পেছনেই থাকে। এটি গলায় নিচের দিকে থাকার ফল হয় যে স্বরতন্ত্রীতে সৃষ্ট কম্পনের আওয়াজ অনুনাদী হবার জন্য গলা ও মুখের বড় একটি সাউন্ড বক্স আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু এর ফলে আমাদের একটি মূল্যও

দিতে হয় এক সঙ্গে নিঃশ্বাস নেওয়া ও খাদ্য গেলা সম্ভব হয় না, চেষ্টা করলে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠে। এই কারণে প্রথম কিছুদিন মানবশিশুর ক্ষেত্রেও স্বরতন্ত্রী উপরে জিহ্বার পেছনেই থাকে, ফলে তারা কথা বলতে পারে না, কিন্তু খাবার খেতে গিয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো বিপদ ঘটেনা। একই কারণে এইপের বাকশক্তি সম্ভব নয়, অস্ট্রালোপিথেকাসেরও সম্ভব ছিল না। মানববিবর্তনে কখন স্বরতন্ত্রী নেমে এসেছে তা সঠিক স্থির করা সম্ভব হয়নি।

ভাষার শারীরবৃত্ত বিবেচনায় মনে হচ্ছে নিয়ানডার্থালরা (এবং হয়তো শেষের দিকের ইরেকটাসরাও) বাকনির্ভর ভাষার জন্য শারীরিকভাবে তৈরি ছিল। তবে জটিল চিন্তার উপযুক্ত বাহন হিসাবে যথাযথ ভাষা সৃষ্টি খুব সম্ভব তাদের মধ্যে আসেনি– এসেছে সেপিয়েন্সদের মধ্যে। তাদের মধ্যেও এটির পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির প্রমাণ রয়েছে ৮০ হাজার বছর বা অনুরূপ সময় আগে থেকে। আর ঠিক এখনই এসেছিল আফ্রিকায় হোমো সেপিয়েন্স সৃষ্টিশীলতার প্রথম বড় স্ফুরণ।

কালচারের পথে প্রথম পদক্ষেপগুলো

হোমো সেপিয়েন্স সৃষ্টিশীলতা ইউরোপে ক্রোম্যাগননদের মধ্যেই প্রথম বিকশিত হয়েছে ৩০ হাজার বছর আগে- এমনি ধারণাই এতদিন মোটামুটি প্রচলিত ছিল। অনেকে অবশ্য এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় একই সময়ে অনুরূপ বিকাশের নিদর্শনগুলোকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ক্রোম্যাননদের মধ্যে মানব কালচারের চিহ্নগুলো মতো স্পষ্টভাবে পাওয়া গিয়েছে যে সে সময়টায় যে আধুনিক মানুষের বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই, এবং সেটি আমরা পরে দেখব। কিন্তু সাম্প্রতিকতম কিছু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে কালচারের প্রারম্ভটি আরও প্রাচীন। প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে মানুষ আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থাতেই তার স্ফুরণ ঘটেছিল। আফ্রিকা থেকে বের হয়ে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনেও এর অবদান ছিল।

এই সময় মানুষের ভাষা ক্ষমতা যে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল তার কিছু জেনেটিক ইঙ্গিত সম্প্রতি ডিএনএ গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের সৃষ্টিশীলতার কিছু সমসাময়িক নিদর্শন হাতিয়ার ও অন্যান্য সামগ্রীরূপে আফ্রিকার নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত নিদর্শন ও ডিএনএ গবেষণায় আরও দেখা যাচ্ছে যে এসময় আফ্রিকায় সেপিয়েন্সদের জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লোম্বোস গুহায় আবিষ্কৃত লালচে নরম পাথরে নক্সা খোদাই করা নিদর্শন (৭৭ হাজার বছর পুরনো) মরক্কোতে পাওয়া বেশ কিছু ছোট ছোট কড়ির উপর প্রত্যেকটিতে একইভাবে ছোট ছিদ্র করা– যাতে স্পষ্টত অলঙ্কার হিসাবে মালা গাঁথার আভাস রয়েছে (৮২ হাজার বছর আগের) এবং অনুরূপ

আরও কিছু কালচার-নিদর্শনে আধুনিক মানুষের প্রথম পদধ্বনি পাওয়া যায়। তবে নমুনাগুলো মতো কম এবং মতো ছড়ানো ছিটানো অনেকে একে ধারাবাহিক কোনো কালচার সৃষ্টির বদলে এটি মানুষের ব্যতিক্রমী কিছু আচরণ বলে কম গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ সময় সেপিয়েন্স অনন্যতাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শিকারের উন্নততর হাতিয়ার, বন্য শস্য জাতীয় খাদ্য খেতে শেখা, মাছ ধরতে শেখা– ইত্যাদি নতুন উদ্ভাবন এসময় দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার সেপিয়েন্সদেরকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতিতে এনে দিয়েছিল। এর আগে আজ থেকে দেড় লক্ষ বছর ও ৭০ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়টি আফ্রিকার এসব অঞ্চলে জলবায়ু খুবই পরিবর্তনশীল ও প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল সে সময়ের বরফ-যুগের কারণে। ও সময়ের সংকটে সেপিয়েন্সের জেনেটিক গঠন আরও উদ্ভাবনশীল হবার পথ করে দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিটি ঘটেছিল এই অনিশ্চিতাবস্থার শেষে ৮০ হাজার বছর আগে। এই ফলশ্রুতিতেই জনসংখ্যা ও সৃষ্টশীলতা তাদেরকে সারা বিশ্বে অভিবাসনের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর বরফযুগ আমাদেরকে আর একবার শুধু আক্রান্ত করেছে তা প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে এবং যার অবসান হয়েছে মাত্র ১০-১১ হাজার বছর আগে।

প্রাচীন সেপিয়েন্সের আধুনিক হাতিয়ার

৮০ হাজার বছর আগে আফ্রিকায় হাতিয়ার সৃষ্টিতে যে উদ্ভাবনশীলতা সেপিয়েন্সরা এনেছিল তার ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমরা পেয়েছি ইউরোপে ক্রোম্যাগনন

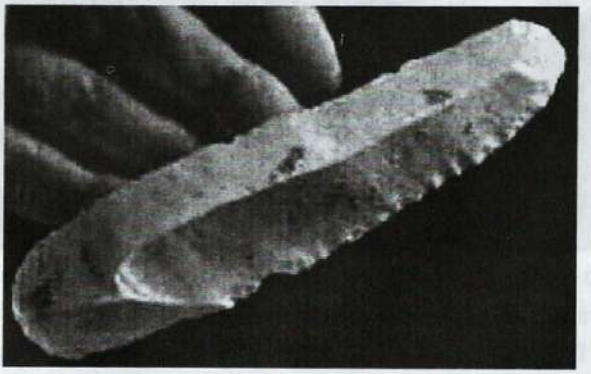

অরিনিয়াসিন হাতিয়ার
ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি
(৩২ হাজার থেকে ২৫ হাজার বছর আগের)
হোমো সেপিয়েন্স পারদর্শিতার সত্যিকার উন্মেষ

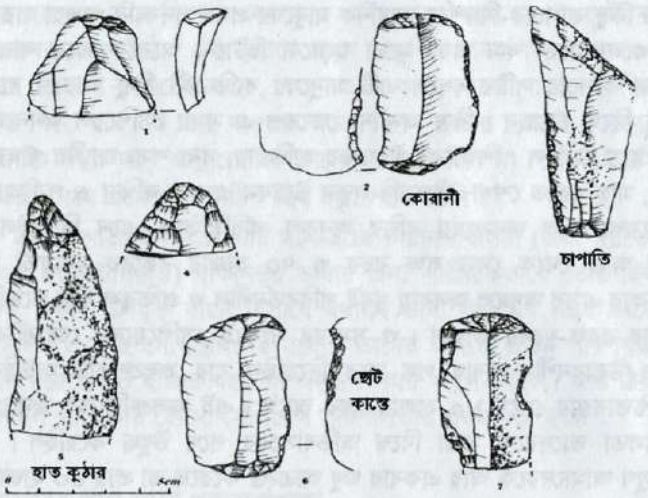

অরিনিয়াসিন হাতিয়ার
কাটা, ছিলা, কোরানো- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে

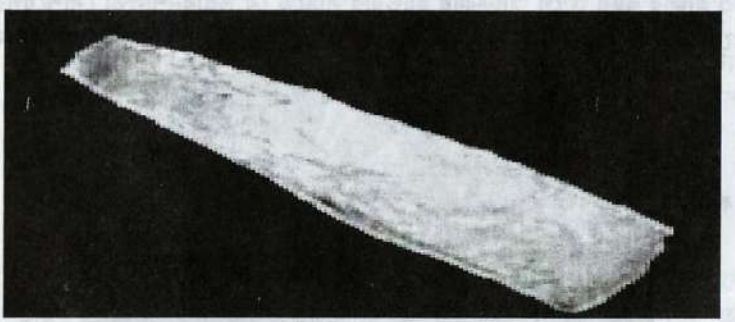

অরিনিয়াসিন হাতিয়ার
ফ্লিন্টের চমৎকার দাঁতালো ছুরি

মানুষদের মধ্যে। ৩০-৩৫ হাজার বছর আগে থেকে শুরু হওয়া হাতিয়ারের এই ধারাকে বলা হয় অরিনিয়াসিন ধারা। ২০-২৫ হাজার বছর অবধি এটি ক্রমেই নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করেছে। এদের অসংখ্য নমুনা ইউরোপের নানা জায়গায় ক্রোমোনিয়ন বসতগুলো থেকে পাওয়া গিয়েছে। পাথর আর হাড়ের

হাতিয়ারগুলোই টেকসই হয়েছে বলে আমাদের হাতে এসেছে। বলতে গেলে এগুলো প্রাচীন সেপিয়েন্সদের প্রথম আধুনিক হাতিয়ার।

আগের মতোই, বিশেষ করে নিয়ানডার্থালদের মাউস্টেরিয়ান ধারার হাতিয়ারের মতো অধিকাংশ ছোট হাতিয়ারগুলো পাতলা ফ্লিন্ট পাথরে তৈরি।

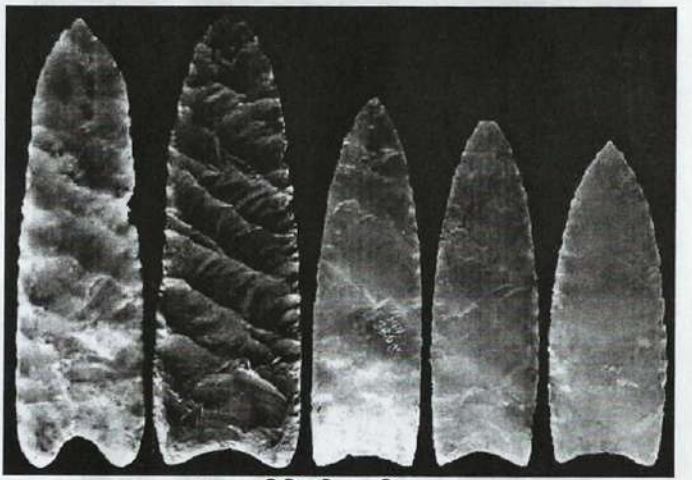

অরিনিয়াসিন হাতিয়ার
ফ্লিন্ট পাথরের গড়া সৌকর্য

কিন্তু এখানে তার সৌকর্য ও কার্যকারিতা অনেক বেশি। যেমন একটি ছুরি, হোক পাথরের ছুরি, তবুও অনেকটা আজকের দিনে আমাদের ব্যবহৃত ছুরির মতো। হাতে ধরার জায়গা, ধারগুলো কোনো কোনোটিতে মসৃণ ধার, কোনো কোনোটিতে দাঁতালো ধার। সে সময়ের সেপিয়েন্স জীবন যাত্রার জন্য যে রকম হাতিয়ার দরকার তার বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল। শিকারের জন্য বর্শাগ্র তৈরি হয়েছে সুন্দরভাবে তীক্ষ্ণ করা ফ্লিন্ট পাথর দিয়ে। বর্শার অগ্রভাগ পশুর শিং দিয়েও তৈরি করা হয়েছে। শিকার করা পশুর চামড়া ছিলার জন্য বিভিন্ন রকম ছুরি– কোনো কোনোটি খুবই ছোট, প্রায় রেজোর ব্লেডের মতো। চামড়া ছিলার পর পোশাক, তাঁবু ইত্যাদি হিসাবে তাকে ব্যবহারের জন্য মাংসের চর্বির পাতলা স্তর ছাড়িয়ে নেবার জন্য স্ক্র্যাপার। কোনো কোনো ছুরির ধারটি বাইরের দিকে নয়, বরং একটু পুরো পাথরের মাঝখানে গর্তের মতো করে সেই গর্তের মধ্যেই ধারালো অংশ– অনেকটা কোরানির মতো করে কোনো কিছু কুরিয়ে নিতে ব্যবহার হতে পারে।

বড় মাংস কাটার জন্য পাথরের ভারি চাপাতি, হাত কুঠার। আগেই বলেছি ইউরোপের শীতে থাকতে গিয়ে ক্রোমোনিয়ানদেরকে চামড়ার ভালো পোশাক

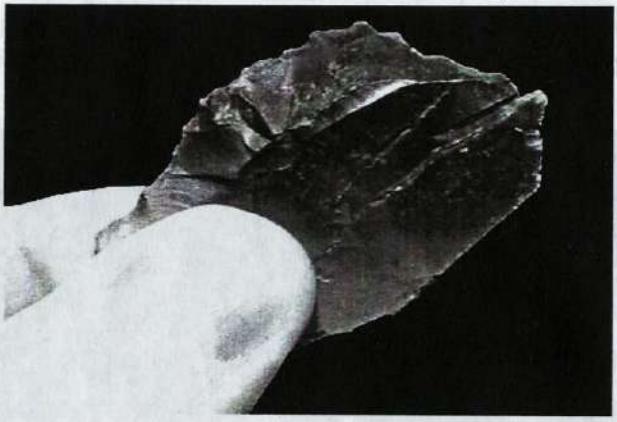

অরিনিয়াসিন সৃষ্টি
ফ্লিন্টের সূক্ষ্ম হাতিয়ার

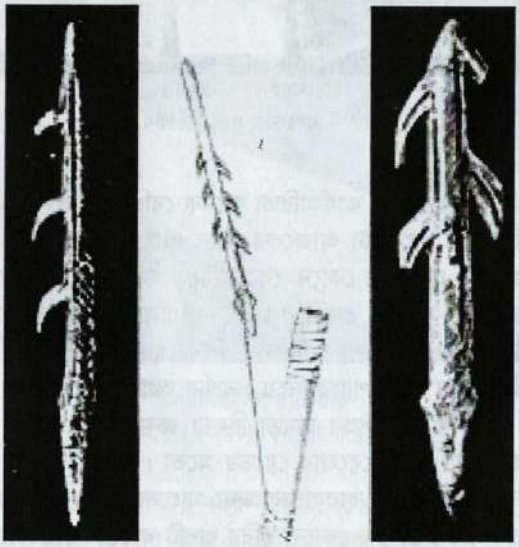

আধুনিকতর হাতিয়ার
শিং-এর তৈরি বর্শার মাথা

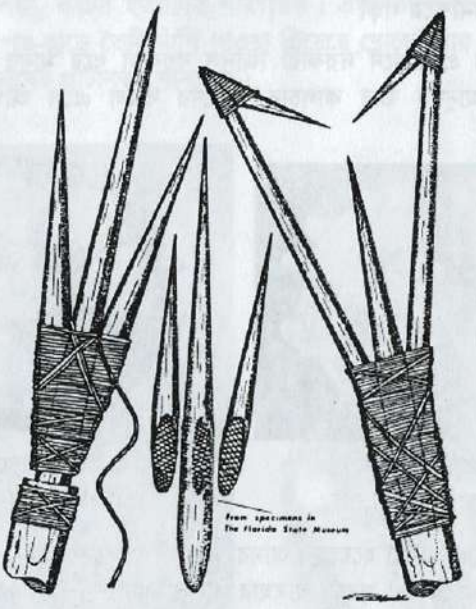

আধুনিকতর হাতিয়ার
হাড়ের তৈরি বড়শি, কোঁচ ইত্যাদি

তৈরি করতে হয়েছে, তা ছাড়া ভালো তাঁবুও তৈরি করতে হয়েছে চামড়া দিয়ে। এজন্য ছিদ্র করার শিক দরকার হয়েছে, আরও সূক্ষ্ম সুচ দরকার হয়েছে– এগুলো সবই পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছে।

হাতিয়ারের সঙ্গে কাঠের হাতল লাগাবার জন্য কৌশলগুলোও বেশ লক্ষণীয়। এজন্য শিং বা হাড়ের মোটা অংশকে ফাটিয়ে ফাটলের মধ্যে হাতলকে গুজে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতল আটকাবার জন্য, জটিলতর যন্ত্রের জন্য– যেমন মাছ মারার কোঁচ ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য শক্ত সুতা বা দড়ির দরকার মেটানো হয়েছে উদ্ভিজ লতা বা চামড়ার ফিতা দিয়ে। প্রয়োজনমতো ছিদ্র করে তার ভেতর দিয়ে যেই সুতা চালানো হয়েছে। টেকসই অংশগুলো দেখে ঐ অংশগুলো আন্দাজ করে নেওয়া যাচ্ছে।

শুধু ইউরোপের ক্রোমোনিয়নদের মধ্যে এগুলো সীমাবদ্ধ ছিলনা। প্রায় একই রকম সময় এশিয়া এবং আফ্রিকার সেপিয়েন্সরাও হাতিয়ারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম সৌকর্য আনছিল। এগুলো সবই সবই অরিনিয়াসিন ধারার অংশ।

মনের মাধুরি মিশিয়ে গড়া

জীবন ধারনের প্রয়োজনে দরকারী জিনিস বহুকাল ধরে মানুষ তৈরি করেছে। কিন্তুএকমাত্র মানুষই তার কালচার স্ফূরণের কালে এসে আপাত বেদরকারি

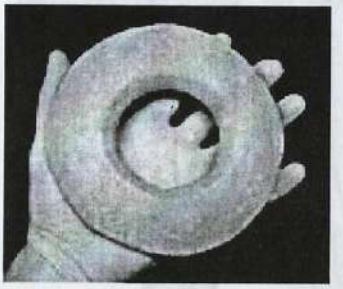

প্রাচীন মানুষের
চিন্তাশীল সুসম সৃষ্টি

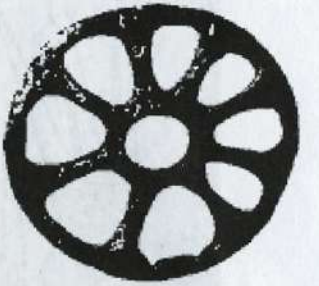

প্রাচীন মানুষের
চিন্তাশীল সুসম সৃষ্টি

জিনিসও বানাতে আগ্রহী হয়েছে। আমরা এ সেপিয়েন্সদের এমন সব জিনিস খুঁজে পাচ্ছি যেগুলোর কোনো জরুরি ব্যবহার থাকার কথা নয়– নেহাত মনের আনন্দে শিল্পকর্ম হিসাবে তারা এগুলো গড়েছে। বহু আগে আফ্রিকা ছাড়ার আগে তাদেরকে তাদেরকে কড়ির মধ্যে ফুটো করে সেগুলোকে পুঁতির মতো মালার ব্যবহার করতে বা আল্পনার মতো নক্সা খোদাই করতে দেখেছি। অরিনিসিয়ান ধারার সময়ে এসে আরও ব্যাপকভাবে এসব শিল্পকর্ম আমরা দেখছি। যেমন ছোট একটি চাকা– শুকানো কাদা দিয়ে গড়া– একেবারে প্রতিসম আংটি আকৃতির, ২৫ হাজার বছর আগে তৈরি। শিল্পীমনের মানুষ ছাড়া এই জিনিস আর কেউ বানাবে না, কারণ এটি জরুরি কিছু নয়। এ সময়ের আরও জটিল সৌকর্যময় ছোট চক্রাকার শিল্প বস্তু পাওয়া গেছে, খুবই যত্নে গড়া। অস্ট্রিয়ায় পাওয়া ২৭ হাজার থেকে ২০ হাজার বছর আগের মধ্যে কোনো সময় তৈরি পুতুলের মতো ছোট্ট নারী মূর্তি আমাদেরকে তাক লাগিয়ে দেয়। নারীকে যে ভাবে দেখেছে হুবহু সেভাবে মূর্তি তৈরি করেনি– তার মাতৃত্বের চিহ্নগুলো যেমন স্তন, গর্ভাবস্থা এগুলো অনেক অতিরঞ্জিত করে গড়া। বুঝাই যাচ্ছে মাতৃত্ব, সন্তানসম্ভবা উর্বরতাকে গুরুত্ব দেবার জন্যই মতো শ্রমসাধ্য এই মূর্তি গড়া। এরকম ছোট নারী মূর্তি নানা-বৈচিত্র্যে বেশ কিছু পাওয়া গিয়েছে। তাতে মনে হয় মাতৃত্ব বা উর্বরতা নিয়ে হয়তো কোনো বিশেষ আচার বা বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এটি। এভাবে আর একটি মানবিক বিকাশের ইঙ্গিত এটি দিচ্ছে– যা ২৫-২৭ হাজার বছর আগে মানুষের

আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, কল্পনা ইত্যাদির পরিচায়ক। এমনিভাবে ৩০ হাজার বছরের পুরনো একটি পশু-হাড়ে তৈরি বাঁশি পাওয়া গিয়েছে স্লোভেনিয়ায়। এটি আমাদের হাতে আসা মানুষের প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র।

প্রাচীন মানুষের গড়া নারী মূর্তি
(২৭,০০০-২০,০০০ বছর আগের)
প্রাপ্তিস্থান : উইলেনডরফ, অস্ট্রিয়া

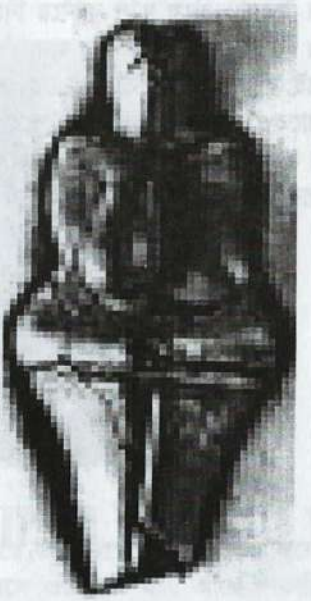

প্রাচীন মানুষের কাদাতে গড়া নারী মূর্তি
(প্রায় ২৫,০০০ বছর আগের)

সুর তোলার প্রয়োজন ও অবকাশ মানুষের সেদিনও দেখা দিয়েছিল। তাতেই বুঝা যায়, সেপিয়েন্সরা কীভাবে কালচার সম্পন্ন 'মানুষ' হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৮৭৯ সালে স্পেনের আলতামিরা নামক গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছিল সেপিয়েন্স কালচারের আর একটি অনন্য নিদর্শন। বাবার সঙ্গে গুহা দেখতে গিয়েছিল বারো বছর বয়সী ছোট একটি মেয়ে। ইউরোপে এরকম গুহায় বেড়াতে যাওয়া এবং ছোটদেরকে প্রকৃতি-পরিচয় করিয়ে দেওয়ার রীতি রয়েছে। অন্ধকার গুহার মধ্যে বাতির আলোকে কি একটি দেখে মেয়েটি চিৎকার করে বাবাকে ডাকলো। 'বাবা, বাবা, দেখে যাও।' গুহার দেয়ালে বেশ একটু উপরে মোটা দাগে লাল রঙে বড়

বড় পশুর ছবি আঁকা। পরে গবেষণায় দেখা গেছে, এই ছবি সাম্প্রতিক কোনো মানুষের আঁকা নয়, বরং ২০ থেকে ২৫ হাজার বছর আগের কোনো মানুষ এটি এঁকেছিল। সেদিনের পরিস্থিতি চিন্তা করা যাক। তখন তো আর কেউ ইচ্ছে করলেই রং তুলি যোগাড় হয়ে যেত না। সেদিনের শিল্পীকে পশুর চামড়া, পশম, আঁশ ইত্যাদি দিযে তুলি বানিয়ে নিতে হয়েছে। উপযুক্ত রঙিন মাটি, শিলা চূর্ণ করে নিচে হয়েছে রং তৈরির জন্য। হয়তো আগের বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে যুৎসই রং তুলি সে তৈরি করতে পেরেছে। আর সেই অন্ধকার গুহায় (দিনের বেলাতেও) দেয়ালের অনেক উপরে উঠে এসব দিয়ে চমৎকার বড় ছবি আঁকাটি তার জন্য সহজ কাজ ছিল না। এগুলো সে শুধু করেনি, এমন ছবি এঁকেছে যে বহু হাজার বছর ধরে তা অক্ষত সৌন্দর্যে থেকে আবিষ্কৃত হতে পেরেছে।

নিয়ানডার্থালদের তৈরি বাঁশি
(প্রায় ৩০ হাজার বছর আগের)
প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান : স্লোভেনিয়া

যখন এঁকেছে কল্পনা থেকে এঁকেছে, ঐ পশুগুলোর ছবি তার মস্তিষ্কেই ছিল। তারপর থেকে বিশেষ করে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে নানা জায়গায় এরকম আরও বেশ কিছু সমসাময়িক চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে– কোনো কোনোটি বেশ রঙিন ও জমকালো। কিন্তু প্রায় সবই বড় আকারের পশু দলের এবং শিকারের চিত্র, যে সব পশুকে তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত সেগুলোরই। প্রায় একই যুগের এবং তারও বেশ পরের অনুরূপ চিত্র এশিয়ায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় সেদিনের মানুষের জন্য শিকারটি জীবিকার জন্য মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই শিকারে সাফল্যের জন্য তাদের মধ্যে নানারকম বিশ্বাস ও আচারের সৃষ্টি

হয়েছিল। হয়তো তাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে গোপন স্থানে, অন্ধকারে ওসব পশুর ছবি আঁকলে এরা কাবু হয়ে যাবে, শিকার সহজ হবে। যে কারণেই আঁকা হোক এগুলো মানুষের আদি শিল্পকর্ম। এরকম সৃষ্টি মৌলিক কল্পনাশক্তি ও শিল্পবোধ ছাড়া সম্ভব নয়।

ক্রোম্যাগননদের গুহাচিত্র
(প্রায় ২৫ হাজার বছর আগের)

অরিনিসিয়ান ধারার হাতিয়ার ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জটিলতর ও উচ্চতর চিন্তার ও কুশলতার বিকাশটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে আজকে যাকে আমরা সভ্যতা (সিভিলাইজেশন) বলি তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে শিকারি সংগ্রাহক জীবন থেকে মানুষের কৃষি ও পশুপালনের জীবনে স্থায়ী বসতে চলে আসার সঙ্গে।

ক্রোম্যাগননদের গুহাচিত্র
(প্রায় ২০ হাজার বছর আগের)

হোমো সেপিয়েন্স যখন সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে
(নিদর্শনের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক চিত্রণ)

সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানই হয়ে পড়ল মানুষের অগ্রগতির নিয়ামক

যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান তুরস্ক ও ইরাকের সংযোগ স্থলের ভূখণ্ডটিতেই মানুষ প্রথম পশুপালন ও কৃষির সূত্রপাত করেছিল ৮ থেকে ১০ হাজার বছর আগে। আর সেটি ছিল মানুষের সভ্যতারও সূত্রপাত। ঐ অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে এটি বিস্তৃত হয়ে পড়ল পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে। বন্য শস্য ও বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে নিজের সুবিধামতো নির্বাচন করে নিতে শিখল মানুষ। ফলে তাদের নিজেদের জীবনধারাতেও আসল একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মানুষের দ্বারা আয়োজিত নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঐ শস্য ও ঐ পশুর মধ্যে এমন জেনেটিক পরিবর্তন আনল যে প্রজন্মান্তরে এগুলো মানুষের চাহিদা অনুযায়ীই সুশৃঙ্খল মৌসুমী আবাদের শস্য আর সুবোধ শান্তশিষ্ট মানবনির্ভর পশুতে পরিণত হলো। মানুষের জীবিকায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এলো, এলো অবকাশ। কয়েক জনের

পরিশ্রমে অন্যান্য আরও কয়েক জনের খাদ্য সংস্থানের সুযোগ ঘটল যারা খাদ্য উৎপাদনের বাইরে অন্য কাজে মন দিতে পারল। এর ফলে এলো আরও সুগঠিত সামাজিক ও পৌর ব্যবস্থা। শিল্পের, আচার অনুষ্ঠানের, কল্পনাশক্তির ও জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বেড়ে গেল অনেক। পোড়ামাটির আসবাব এলো, ধাতুর ব্যবহার এলো, বড় স্থাপত্য নির্মাণে মনোযোগ গেল। সবচেয়ে বড় কথা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে মানুষ এগিয়ে গেল ও নিজের অগ্রগতির জন্য তার উপরেই নির্ভর করতে শিখল। তারপর থেকে সংকটে পড়লে মানুষ নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়েই তাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে যথাসম্ভব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সংকটে উত্তরণের উপায় হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে দেবার পরিবর্তে। এই যে সভ্যতার বিকাশ ১০ হাজার বছর আগে নাগাদ ঘটল, তার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। ঐ সময়েই অবসান হয়েছিল শেষ বরফযুগের। আগের বারের বরফযুগের অবসানে যেমন আফ্রিকায় প্রথম মানব কালচারের উন্মেষ হয়েছিল ৮০ হাজার বছর আগে এবারো যেন তাই হলো।

ক্রোম্যাগননদের গুহাচিত্র
(প্রায় ২০ হাজার বছর আগের)

এক ভাবে দেখতে গেলে সভ্যতার বিকাশ মানব-ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। এর পর থেকে অন্য প্রাণীদের মতো করে নয়, বরং নিজের অত্যন্ত অনন্য এই মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েই রচিত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ। সভ্যতার

এই কাহিনী বড় জোর মাত্র দশ হাজার বছরের। কিন্তু মানুষের অনন্যতার ভিত রচিত হয়েছে অন্তত প্রায় ৫০ লক্ষ বছর ধরে একটু একটু করে। লুসির দুই পায়ে দাঁড়ানো পদক্ষেপগুলোতে, হোমো হাবিলিসের হাতিয়ার হিসাবে পাথরকে গড়ে নেবার চেষ্টায়, হোমো ইরেকটাসের বিশ্ব যাত্রায়, নিয়ানডার্থালের শীতকে জয় করায় আর সেপিয়েন্সদের আলতামিরার গুহাচিত্রে সেই ভিতগুলোকেই আমরা কিছুটা দেখার চেষ্টা করলাম।

ক্রোম্যাগননদের গুহাচিত্র

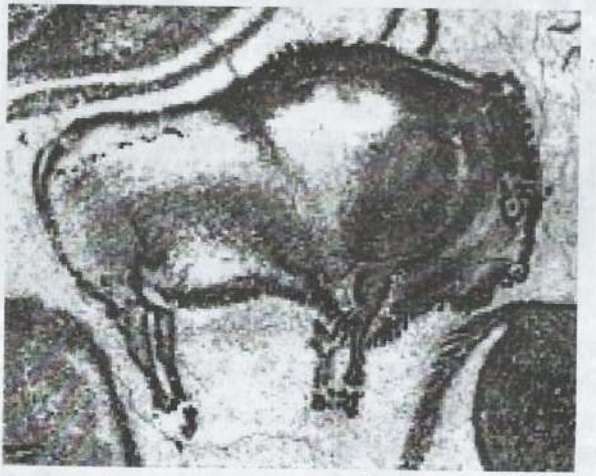

ক্রোম্যাগননদের গুহাচিত্র
(প্রায় ২৫ হাজার বছর আগের)

সেপিয়েন্সদের মৃৎপাত্রের প্রাথমিক নমুনা
(প্রায় আট হাজার বছর আগের)

বক্তৃতাশেষে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। অতীত পৃথিবীর কথায় আমরা দেখলাম যে, পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির পর আবার শৈত্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে মানুষের ওপর বিবর্তনের সংকট এসেছে। বর্তমান উত্তাপ বৃদ্ধির পরও তো এরকম আবার শৈত্য আসবে। তা হলে দুশ্চিন্তা কী নিয়ে?

উত্তর : যে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বে উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেটি নতুন কিছু নয়। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর শুরু থেকেই সেটি যথেষ্ট পরিমাণে বহুবার ঘটেছে, আবার প্রাকৃতিক কারণেই তা কমেও গেছে, শৈত্য সৃষ্টি হয়েছে। অতিরিক্ত গ্রীনহাউজ গ্যাস বাতাসে গিয়ে বর্তমানে যে উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা এই প্রাকৃতিক কারণের অতিরিক্ত মানবিক কারণে ঘটছে। এর পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত বড় রকমের জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেই এই উদ্বেগ। যার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে ব্যাহত হতে পারে। এর ফলে বিবর্তনের দিক থেকে কোনো চাপ আসবে কিনা তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে এর মোকাবেলা করতে পারলে তা আসার কথা নয়।

প্রশ্ন ২। মানব বিবর্তনের ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোতে কী ধরনের সংকট ও কী ধরনের পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়?

উত্তর : অতীতে সর্বশেষ মানব বিবর্তনগুলো ঘটেছিল মস্তিষ্কের উন্নয়নের মাধ্যমে। তাই কেউ কেউ মনে করতে পারেন মানব মস্তিষ্ক আরও উন্নত হবে একই প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু তার প্রয়োজন এবং সে সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপ অনেকাংশে কমে গিয়েছে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণে। এখন সংকট মোকাবেলায় দৈহিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে না বরং নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের

দ্বারাই মানুষ তা মোকাবেলা করছে। কাজেই সেই অর্থে মানুষ এখন আর বিবর্তনের চাপের মুখে নাই– সে রকম বড় কোনো পরিবর্তন হয়তো মানুষের আর আদৌ প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ৩। আপনি বলেছেন হোমো ইরেকটাসদের সময় দ্রুত মস্তিষ্ক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মাংসভোজী হওয়া– যাতে প্রোটিনসমৃদ্ধ দক্ষতর খাদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল বলা হয় নিরামিষ খাবারই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যারা নিরামিষি তারা মস্তিষ্কের উন্নতি কি ভাবে করবে?

উত্তর : হোমো ইরেকটাসদের সময়ের এমন পরিস্থিতির কথা বলেছি যার আগে এইপের মতো বনের পাতা, ফল ইত্যাদি প্রকৃতির থেকে যখন যা পাচ্ছে সংগ্রহ করে খাওয়া ছাড়া মানব-সদৃশদের উপায় ছিল না। এগুলোর পুষ্টির দক্ষতা খুব কম ছিল, এতে আমিষের ভাগও খুব কম, প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে অনেক খেতে ও অনেক হজম করতে হতো। আজকের নিরামিষি হবার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আজকে যাঁরা ইচ্ছে করে ভেজিটেরিয়ান হন তাঁরা মাছ-মাংসবিহীন খাদ্য থেকেই উন্নতমানের আমিষ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে পুষ্টির অসুবিধা তাঁদের হয় না। অন্যদিকে হোমো ইরেকটাসের দ্রুত বর্ধনশীল মস্তিষ্কের জন্য সরাসরি প্রাণিজ আমিষ পাওয়াটি তখন বেশ সুবিধাজনক হয়েছিল।

প্রশ্ন ৪। হোমো হাবিলিসদের সময় মস্তিষ্ক বাড়তে শুরু করেছিল। তাদের থেকে হোমো ইরেকটাসদেরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন?

উত্তর : হোমো হাবিলিসের সময় ছিল কিছুটা অস্থির সময়। মস্তিষ্কের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু কোনো প্রজাতি বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছিল না। হোমো ইরেকটাসদের সময়ে এসে এটি দীর্ঘ স্থিতি পেয়েছে– প্রায় ১৫ লক্ষ বছরেরও উপর সময় ধরে। তারা তাদের উন্নত মস্তিষ্ক ব্যবহার করে বিশ্বময় ছড়াতে পেরেছিল, হাতিয়ারের ও জীবনযাত্রার নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

প্রশ্ন ৫। দুতিন শবছর আগের আমাদের পূর্ব পুরুষদের ডিএনএ পরীক্ষা করে আমরা কি তাদের সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারি?

উত্তর : এটি অসম্ভব নয়। ৩০ হাজার বছর আগের সেপিয়েন্স বা নিয়ানডার্থাল ডিএনএ যখন বিশ্লেষণ করা গিয়েছে এও করা সম্ভব। তবে বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত ডিএনএ পুরনো মৃতদেহ থেকে পাওয়া খুবই কঠিন ও বিরল ঘটনা।

প্রশ্ন ৬। শুনেছি আমার দাদার এবং তারও আগের আমলে তাঁরা খুব শক্তিশালী ছিলেন– অনেক শারীরিক পরিশ্রম করতে পারতেন, অথচ এখন আমরা তা পারি না। এটি কি টেকনোলজি নির্ভরশীলতার ফলে আমাদের দেহে বিবর্তনের লক্ষণ?

উত্তর : বিবর্তন মতো অল্প সময়ে ঘটে না, তবে জীবনযাত্রার প্যাটার্নের ফলে বিভিন্ন মানুষের শারীরিক গঠনে এভাবে পরিবর্তন ঘটে। হয়তো কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে বলে আমাদের কারও কারও অভ্যাসে ও সক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সময় খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টি ইত্যাদির ফলেও এরকম পরিবর্তন আসে। এর সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক নাই। যেমন অতি দরিদ্র শিশুরা পুষ্টির অভাবে ছোট বেলায় তাদের দেহ-বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়ে বেঁটে হয়ে পড়তে পারে। উন্নত পুষ্টির ফলে একটি দেশের গড় জনসংখ্যার দেহের দৈর্ঘ্যই বেড়ে যেতে পারে। এগুলো জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত নিত্য পরিবর্তন একই প্রজন্মে কিংবা দু-এক প্রজন্মেই ঘটতে পারে। এগুলো বিবর্তন নয়।

প্রশ্ন ৭। আপনি আফ্রিকার অনেক মানব ফসিলের কথা বলেছেন। ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের ফসিলের কথাও বলেছেন, কিন্তু আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো ফসিলের কথা বলেননি। প্রাচীন মানুষরা কি এখানে ছিল না?

উত্তর : আমরা এখানে আলোচনা করেছি কতকগুলো শুধু বিখ্যাত ফসিল নিয়ে– যেগুলো প্রাচীন নৃতত্ত্বে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো ফসিল আসেনি। এর মানে এই নয় যে এখানে প্রাচীন ফসিল পাওয়া যায়নি, বা তখন এখানে মানুষ ছিল না। বরং দেখা গেছে যে আফ্রিকা থেকে হোমোসেপিয়েন্সরা ৮০ হাজার বছর আগে বের হয়ে আসার পরপরই কিছু মানুষ দক্ষিণ ভারতের উপকূল ধরে পুর্বে গিয়েছিল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ৫০-৬০ হাজার বছর আগের মানব বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। আর ফসিলের বিষয়টি এমন যে আগামী কালই হয়তো এখানে এমন কোনো ফসিল হঠাৎ আবিস্কৃত হতে পারে যাতে মানুষের প্রাচীন অভিবাসন সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ৮। আমরা জানলাম যে হোমো ইরেকটাসরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে খুব সফলভাবে সারা দুনিয়ায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল কেন?

উত্তর : এই বিলুপ্তির বিষয়টি কিছুটা রহস্যময়। এটি শুধু ইরেকটাসদের ক্ষেত্রে ঘটেনি, সেপিয়েন্স ছাড়া অন্য সব মানব প্রজাতির ক্ষেত্রেই ঘটেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোনো বড় সংকটে পড়লে এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে না পারলে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইরেকটাসরা হয়তো এক এক জায়গায় এক এক কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। স্থানীয় অন্যদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা তার একটি কারণ হতে পারে। কোনো সময় জনসংখ্যা খুবই ছোট দলে আবদ্ধ হয়ে পড়লে এমন ঘটতে পারে। একেবারে শেষের দিকে হয়তো আমরা সেপিয়েন্সরাই তাদের বিলুপ্তির কারণ হয়েছি। নিশ্চিত করে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ৯। আজকের মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে আমরা অতীতের মানুষদের সম্পর্কে জানতে পারছি। একইভাবে কি ভবিষ্যতের মানুষদের সম্পর্কেও জানতে পারবো?

উত্তর : ডিএনএ তো বর্তমানের জিনিস যা অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসে এখন কী দাঁড়িয়েছে তা এর বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারি। বিভিন্ন মানুষের ডিএনএ-র মধ্যে বৈচিত্র্য দেখে, পরিবর্তনগুলো লক্ষ করে অতীতের কিছু বিষয় এর মাধ্যমে আন্দাজ করা সম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে তাতো ডিএনএ বলে দিতে পারবে না।

প্রশ্ন ১০। আফ্রিকা থেকে মানুষের বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে কন্টিনেন্টাল ড্রিফটের কি কোনো ভূমিকা ছিল?

উত্তর : কন্টিনেন্টাল ড্রিফট হচ্ছে ভূত্বকের বড় বড় প্লেইটগুলোর অনেক নড়াচড়ার ফলে মহাদেশীয় বিন্যাসে পরিবর্তন যা খুব ধীর গতিতে ঘটেছে, এখনো ঘটছে। আমরা মানব-বিবর্তনের যে সময়ের কথা বলছি তুলনামূলকভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে এই ড্রিফট খুব বড় আকারে ঘটেনি। সে জন্য মানব অভিবাসনে সেটি বড় ভূমিকা রাখেনি। তবে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সে সময়ও ঘটেছে। যেমন সমুদ্র-তল নেমে গিয়ে অনেক সময় মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপের মাঝখানে স্থল-সেতু দেখা দিয়েছে। এতে কোনো কোনো সময় মানুষের ছড়িয়ে পড়তে সুবিধা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন কি ঐ অভিবাসনে কোনো ভূমিকা রেখেছে?

উত্তর : হ্যাঁ সেটি অবশ্যই রেখেছে। সর্বভূক হয়ে শিকারি জীবন বেছে নেবার ফলেই মানুষকে ক্রমাগত নতুন নতুন জায়গায় যেতে হয়েছে। আগের মতো বনের মধ্যে বাদাম খেলে এর প্রয়োজন হতো না।

প্রশ্ন ১২। আমরা হোমোসেপিয়েন্সরা কি চিরদিন হোমোসেপিয়েন্স থাকব, নাকি অন্য আরও উন্নত মানব প্রজাতিতে পরিণত হবো?

উত্তর : এর উত্তর আগাম দেওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে নানা সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। বিবর্তন জিনিসটি যেহেতু বেশ কিছুটা দৈবাত ঘটনা, একমাত্র পরিস্থিতিই যথাসময়ে সেটি নির্ধারণ করতে পারে। তবে আজকাল বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান মতো হলো যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে বিবর্তনের সাধারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপগুলো আমাদের উপর প্রযোজ্য হবে না– অন্তত সে রকম কঠিনভাবে প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন ১৩। বিবর্তনের জন্য যে সংকট প্রয়োজন, আমাদের ক্ষেত্রে সেই সংকট কী রকম হতে পারে?

উত্তর : আমরা যে সকল সংকটের বিষয় ইতোমধ্যে মানব বিবর্তনে দেখেছি তার সবই ইকোলজিক্যাল সংকট। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন সেগুলোতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতের সংকটও সেরকম না হবার কোনো কারণ নাই।

প্রশ্ন ১৪। আপনি বলেছেন ভবিষ্যতে আমরা আমাদের সংকটগুলো টেকনোলজি দিয়ে মোকাবেলা করব। আমাদের জানামতো পৃথিবীর এমন অনেক জায়গা আছে দেখানে সভ্যতার আলো এখনো ভালোভাবে প্রবেশ করেনি। সেখানে উন্নত টেকনোলজি কোথায় যে তারা তা দিয়ে সংকট উত্তরণ করতে পারবে?

উত্তর : আজকাল পৃথিবীর মূলধারার বাইরে এভাবে টেকনোলজির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে যাচ্ছে–। পুরো মানব প্রজাতি মোটামুটি এক ধারাতেই চলছে– সহজে এর কোনো গোষ্ঠীকে সংকটে পড়তে সে দেবে না। তার টেকনোলজির পূর্ণ ব্যবহার সব জায়গার জন্যই করার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন ১৫। হোমোসেপিয়েন্স মস্তিষ্ক আরও উন্নত হবার তাগিদ অনুভব করছে না কারণ তারই সৃষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞান এই উন্নয়নের কাজটি নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অন্য যে সব প্রাণীর সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান নাই তাদের মস্তিষ্ক তো বিবর্তিত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কের সমতুল্য হয়ে পড়তে পারে একদিন।

উত্তর : তাতে নীতিগতভাবে কোনো অসুবিধা নাই। হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তাও নাই। তবে সমস্যা হচ্ছে আমরা মানুষরা আদৌ তা হতে দেব কিনা। কারণ আমাদের প্রভাব এখন অন্য সব প্রাণীর উপর মতো বেশি যে আমরা সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছি। খুব সম্ভব মানুষের এই প্রভাব অন্য প্রাণির মস্তিষ্ককে মানুষের কাছাকাছি আসতে কখনোই দেবে না। এটি দুঃখজনক, কিন্তু হয়তো অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন ১৬। পৃথিবীর সব মানুষ এখন হোমোসেপিয়েন্স। কিন্তু তাদের মধ্যে ককেশিয়ান, মোঙ্গলয়েড ইত্যাদি নানা গোষ্ঠী রয়েছে। সেক্ষেত্রে কি আমরা বিবর্তনের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি?

উত্তর : না, তা নয়। সব হোমোসেপিয়েন্স চিরকাল পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, প্রজনন প্রক্রিয়ায় জেনেটিক উপাদান বিনিময় করেছে। ফলে তারা তাদের স্থানীয় ও বংশগত নানা পার্থক্য নিয়েও একইভাবে বিবর্তিত হয়ে

হুবহ একই প্রজাতি থেকেছে। বিভিন্ন স্তরের পার্থক্য একই প্রজাতির মধ্যে থাকতেই পারে– কিন্তু সেগুলো মৌলিক কোনো পার্থক্য নয়– অধিকাংশই বাহ্যিক পার্থক্য। একই পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যেও সেরকম পর্যায়ের পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রশ্ন ১৭। আপনি বলেছেন অস্ট্রালোপিথেকাসের স্ত্রীজাতীয়রা দৈহিকভাবে ছোট ছিল। এটি কেন ছিল?

উত্তর : বিবর্তনের ফলে অনেক প্রাণীতে সে রকম হয়েছে– এইপের ক্ষেত্রেও হয়েছে। স্ত্রীদের ছোট ও পুরুষদের বড় হওয়ার মধ্যে সে পর্যায়ে হয়তো কোনো বিবর্তনগত সুবিধা ছিল। কিন্তু হোমো ইরেকটাসদের মধ্যে এসেএ সুবিধাটুকু অন্য রকম হয়ে পড়েছিল। তখন অসহায় শিশুকে পালন করার জন্য স্ত্রীকে বড় হতে হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সমান দৈহিক আকৃতির হতে হয়েছে– যা এখনো আমরা আছি।

প্রশ্ন ১৮। আপনি বলেছেন হোমো ইরেকটাসরা মাংসভোজী হয়েছে মস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য। তারা কি ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে মাংস খেলে তাদের ব্রেন বাড়বে?

উত্তর : না বিবর্তন সেভাবে বুঝেসুজে কাজ করে না, কোনো কিছু লক্ষ নিয়েও এগোয় না। এটি ঘটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপে অনেকটা দৈবাৎ ভাবে। মানব-সদৃশ উদ্ভিদভোজীরাও কেউ কেউ কিছু কিছু মাংস তখন খাচ্ছিল। তাদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের নির্বাচনী সুবিধা বেশি এসেছে বলে, তারাই বেশি টিকেছে– এবং শেষ পর্যন্ত সর্বভূক মাংসভোজীরা টিকে বংশ বিস্তার করেছে বেশি– এবং সরাসরি প্রোটিন প্রাপ্তি তাদের মস্তিষ্ক বড় হতে সহায়ক হয়েছে।

প্রশ্ন ১৯। সবকিছুর শুরু আফ্রিকাতেই হলো কেন? এশিয়াতে নয় কেন?

উত্তর : এটিও একটি দৈবাত ঘটনা। আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থান, সেখানকার এইপ জাতীয় প্রাণীদের পরিস্থিতি, সব মিলে সংকটগুলো এবং তার বিবর্তন-প্রভাব আফ্রিকাতেই বার বার এসেছিল। এইপ সে সময় এশিয়াতেও ছিল– যেমন ওরাং ওটাং। কিন্তু তারা সে রকম সংকটে পড়েনি, পড়লেও সেভাবে সাড়া দেয়নি নির্বাচনী চাপে।

প্রশ্ন ২০। অন্য সবাই বিলুপ্ত হলেও সেপিয়েন্সরা বিলুপ্ত হলো না কেন?

উত্তর : এটি কিছুটা তাদের টিকে থাকার উচ্চতর ক্ষমতার কারণে, তবে অনেকটাই দৈবাত ভাগ্যের জোরে। শুরুর দিকে এমন অনেক বড় সংকটের মধ্য দিয়ে তারা গিয়েছে, জনসংখ্যা বার বার এমন দারুণভাবে কমে বিরল হয়ে

গিয়েছে, যে বিলুপ্ত না হওয়াটাই বিস্ময়ের কথা ছিল। সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের পর অবশ্য বিলুপ্তির সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। তবে আমরা কখনোই যে আশঙ্কামুক্ত তা বলা যাবে না– বিশেষ করে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে এটি হতে পারে।

প্রশ্ন ২১। এখন মানুষের হাতের আঙ্গুল দশটি। আগে কি কখনো বেশি বা কম ছিল, যে বিবর্তনের ফলে দশটি হয়েছে?

উত্তর : না কখনোই ছিল না। আসলে হাতের বা পায়ের দশটি আঙ্গুল থাকার ব্যাপারটি মানুষের নিজের চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রাচীন। কোনো কোনো মাছের পাখনা যখন বিবর্তনে পরিবর্তিত প্রাণীর হাত-পায়ের মতো অঙ্গে পরিণত হয়েছিল তখনই ঐ পাখনার হাড় এমনভাবে আঙ্গুলে পরিণত হয়েছে যে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচটি আঙ্গুলই ছিল। সেই থেকে অধিকাংশ প্রাণীতে- যেমন বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীতে তাই ছিল, যদিও কোনো কোনো প্রাণীতে কোনো কোনো আঙ্গুল ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এরকম বিবর্তনের অনেক জিনিস পূর্বসুরি প্রাণীদের ক্ষেত্র থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল যা পরবর্তীরাও পেয়েছে। যে সব জিন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে সেগুলো প্রাণিবিবর্তনে অনেক প্রাচীন ধারা থেকেই চলে আসছে, আমরাও পেয়েছি।

প্রশ্ন ২২। এখন অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর সন্ধান করা হচ্ছে। অন্য কোনো গ্রহে কি মানুষের চেয়েও উন্নত কোনো প্রাণি থাকতে পারে?

উত্তর : নীতিগতভাবে পারে। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে এখনো কিছুই জানি না। পুরো মহাবিশ্বের কথা বিবেচনা করলে আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহ অসংখ্য থাকার কথা। সেখানে কোথাও প্রাণ আছে কিনা, সেটি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা জানি না। তবে একই পরিস্থিতিতে একই রকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাতো থেকেই যায়। সেজন্যই মানুষ বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধানের গবেষণা আগ্রহভরে চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২৩। বলেছেন যে হোমোসেপিয়েন্সদের আগে ভাষা ছিল না, তা হলে তারা মনের ভাব কিভাবে প্রকাশ করতো?

উত্তর : ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাণী নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারে– নানা রকম ধ্বনি তুলে, ইশারা করে ইত্যাদি। যদিও এভাবে তারা শুধু সীমিত ভাবই প্রকাশ করতে পারে। খুব সম্ভব ইরেকটাস, নিয়েনডার্থাল ইত্যাদি উন্নততর মানব-প্রজাতির ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাটি অনেকদূর গিয়েছিল– যদিও ঠিক ভাষার অধিকারী তারা হয়নি।

প্রশ্ন ২৪। হোমো হাবিলিসি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে হোমো ইরেকটাসরা দেখা দিয়েছে। এমনি একটি থেকে অন্য মানব-প্রজাতি কিভাবে সৃষ্টি হয়, তাদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কী?

উত্তর : এটি এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি সৃষ্টির বিবর্তন পদ্ধতি– যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা বক্তৃতার শুরুতেই দিয়েছিলাম। একটি প্রজাতির মধ্যে যে নানারকম বৈচিত্র্য নিত্য সৃষ্টি হয় সে রকম কিছু বিশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে যখন তার ছোট একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন হয়তো ঐ ব্যতিক্রমী বৈচিত্র্যের কারণে দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, অথবা তার পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তনের কারণে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোই হয়তো তাকে আরও বেশি সহায়তা দেয় বেঁচে থাকতে। পরের ক্ষেত্রে কালক্রমে তার বংশ মূল দল থেকে পৃথক অন্য একটি প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। এমনকি পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতায় প্রতিকূল সংকটে মূল দল বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই নতুন প্রজাতি বিস্তার লাভ করে। এভাবেই বিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ২৫। আমরা দেখেছি শিম্পাঞ্জি এখন দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা করতে পারে। ভবিষ্যতে বিবর্তনের ফলে শিম্পাঞ্জি কি মানুষের মতোই উচ্চ স্তরের চিন্তা করতে পারবে?

উত্তর : শিম্পাঞ্জিকে বিবর্তিত হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। লুসির মতো মানব-সদৃশদের কাল থেকে অর্থাৎ সেই পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে থেকে শিম্পাঞ্জি হয়তো ঠিক যে রকম ছিল তেমনই আছে। আসলে যে সব প্রাণী পরিস্থিতির সঙ্গে ভালোমতো খাপ খেয়ে যায় তারা আর বিবর্তিত হয় না। শুধু কোনো কোনো প্রাণী পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে, যাকে আমরা সংকট বলছি তার ফলে বিবর্তিত হয়– তা ভালর দিকেও হতে পারে, খারাপের দিকেও হতে পারে। এক সময় পৃথিবীতে জীব বলতে ব্যাকটেরিয়াই শুধু ছিল। তাদেরই কোনো কোনোটি বিবর্তিত হয়ে আজকের মতো জটিলতর প্রাণিজগত হয়েছে। অথচ ঐ ব্যাকটেরিয়াই আবার অনেকগুলো রয়ে গেছে হুবহু সেই রকম ব্যাকটেরিয়া হিসাবেই। কাজেই বিবর্তন নির্দিষ্ট কোনো প্রজাতির জন্য অবশ্যম্ভাবী নয়, তবে অসম্ভবও নয়। এটি অনেকটা দৈবাৎ ঘটনা।

প্রশ্ন ২৬। হোমোসেপিয়েন্সরা কি প্রথম থেকেই ভাষা ব্যবহার করতে পারত? নাকি এটি তাদেরকে ধীরে ধীরে শিখতে হয়েছে?

উত্তর : এটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন সেপিয়েন্সদের আগে প্রায়-জ্ঞানীরা, যেমন নিয়ানডার্থালরাও ভাষা ব্যবহার করতে পারত। সেপিয়েন্সদের মধ্যে তা একই ধারাবাহিকতায় এসেছে। আবার অনেকে মনে করেন নিয়ানডার্থালদের ভাষা ঠিক প্রকৃত ভাষা ছিলনা, এ এক ধরনের প্রোটো-

ভাষা। এমনকি প্রথম যুগের সেপিয়ান্সদেরও প্রকৃত ভাষা ছিল না। তবে সবাই মোটামুটি একমত যে ৬০ হাজার বছর আগের সেপিয়েন্সরা পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষা আয়ত্ব করেছিল এবং তখন থেকে তাদের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য ছিল।

প্রশ্ন ২৭। আপনি বলেছেন এক সময় কোথাও নিয়ানডার্থালরা আর সেপিয়েন্সরা পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করেছে। তেমনি অন্যত্র ইরেকটাসরাও সেপিয়েন্সদের পাশাপাশি এক সঙ্গে বাস করেছে। এর মানে তারা একই জলবায়ুর সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। অথচ এতে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে গেল সেপিয়েন্সরা বিলুপ্ত হলো না কেন?

উত্তর : তাদের পারিপার্শ্বিকতা বা সংকট একই থাকলেও সেই সংকট মোকাবিলা করতে তাদের সক্ষমতা এক রকম ছিল না। সেপিয়েন্সদের সেই সক্ষমতা অধিক ছিল বলে তারা টিকে রয়েছে, অন্যরা বিলুপ্ত হয়েছে। আবার আর একটি মতো হচ্ছে সেপিয়েন্সরাই হয়তো ওদের বিলুপ্তি দ্রুততর করেছে নিজেদের আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে এখনো নিশ্চিত হবার উপায় নেই।

প্রশ্ন ২৮। আমরা জেনেছি প্রায় সব জায়গায় ৫০-৬০ হাজার বছর ধরে সেপিয়েন্সরা বিস্তৃত হয়েছে। তাছাড়া আগের মানব প্রজাতিরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে সব জায়গায় বিস্তৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু আমেরিকা মহাদেশ। সেখানে মাত্র ১১-১২ হাজার বছর আগে প্রথম মানুষ গিয়েছে। এটি কেন এবং তা আমরা কী ভাবে বুঝলাম।

উত্তর : মানুষ যে যায়নি তার প্রমাণ হলো সেখানে ১২ হাজার বছর থেকে বেশি পুরনো কোনো মানব ফসিল পাওয়া যায়নি। বেরিং প্রণালীর মাধ্যমে এর আগে দীর্ঘ কাল এশিয়া আর উত্তর আমেরিকা বিচ্ছিন্ন থাকায় মানুষের যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। পরে অবশ্য স্থলসেতু দেখা দেয়।

প্রশ্ন ২৯। আমরা আপনার দেওয়া উদাহরণে মানুষের পঞ্চম স্তর পর্যন্ত চিন্তা করতে দেখলাম। ভবিষ্যতে মানুষ কি আরও উচ্চ স্তরে চিন্তা করবে?

উত্তর : আসলে যারা এ রকম চতুর্থ বা পঞ্চম স্তরের চিন্তা করতে পারে তাদের জন্য আরও উচ্চতর স্তরের চিন্তা কঠিন নয়। মানুষ সেটি বরাবরই করে আসছে। তবে এক পর্যায়ে এটি মানুষের জন্য ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। তাই এখন মানুষ কম্পিউটারের ওপর ছেড়ে দিতে পারে– প্রায় অসীম স্তরের চিন্তা করার জন্য। এটিই আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য। সে নিজে যা ক্লান্তিকর মনে করবে তা নিজের টেকনোলজির ওপর ছেড়ে দেবে। এখন তার টেকনোলজিই নতুন নতুনভাবে বিশ্বজয় করছে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে সচেষ্ট রয়েছে।